ISSN-0971-8435

যোজনা

ধনধান্যে

জুন, ২০১৮ | উন্নয়নমূলক মাসিক পত্রিকা | ₹ ২২

পরিবর্তনের পথে ভারত

ডিজিটাল প্রযুক্তি মারফত উন্নয়ন
অমিতাভ কান্ত

বিকাশের লক্ষ্যে সরকারের রণকৌশল
রাজীব আহুজা

স্বচ্ছ ভারত : স্বচ্ছতার লক্ষ্যে এক কদম
পরমেশ্বরণ আইয়ার

ফোকাস
নারী ও শিশু সুরক্ষা : সরকারের অগ্রাধিকার
রাকেশ শ্রীবাস্তব

বিশ্ব যোগ দিবস উপলক্ষ্যে
সিদ্ধ যোগ
আর. এস. রামস্বামী

রাষ্ট্রীয় গ্রাম স্বরাজ অভিযান ও জনজাতিদের সার্বিক উন্নয়নের রূপরেখা উন্মোচন করলেন প্রধানমন্ত্রী

জাতীয় পঞ্চায়েতি রাজ দিবস উপলক্ষ্যে মধ্যপ্রদেশের রাজ্যপাল আনন্দীবেন প্যাটেল ও মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহানের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

মধ্যপ্রদেশের মন্ডলায় সম্প্রতি রাষ্ট্রীয় গ্রাম স্বরাজ অভিযানের সূচনা করলেন প্রধানমন্ত্রী। এর পাশাপাশি জনজাতিদের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে আগামী পাঁচ বছরের রূপরেখাও উন্মোচন করেন তিনি। মন্ডলা জেলার মানেরিতে ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশনের এলপিজি বোতলজাতকরণ প্যান্ট-এর শিলান্যাস করেন প্রধানমন্ত্রী। উন্মোচন করেন স্থানীয় সরকারের একটি ডিরেক্টরি-ও। যেসব গ্রাম ১০০ শতাংশ ধোঁয়াহীন রান্নাঘর, মিশন ইন্দ্রধনুষের আওতায় ১০০ শতাংশ টিকাকরণ ও সৌভাগ্য প্রকল্পে ১০০ শতাংশ বৈদ্যুতীকরণের লক্ষ্যমাত্রা ছুঁতে সফল হয়েছে, সেখানকার পঞ্চায়েত প্রধানদের সংবর্ধিত করেন প্রধানমন্ত্রী।

মন্ডলা থেকেই দেশের সমস্ত পঞ্চায়েত প্রতিনিধিদের উদ্দেশে প্রধানমন্ত্রীর বার্তাতে উঠে আসে মহাত্মা গান্ধীর গ্রামোদয় থেকে রাষ্ট্রদয়ের আহ্বান ও 'গ্রাম স্বরাজ'-এর কথা। তিনি আরও বলেন যে মহাত্মা গান্ধী সবসময় গ্রামের গুরুত্বের ওপর জোর দিতেন আর 'গ্রাম স্বরাজ'-এর প্রসঙ্গ তুলে ধরতেন। সকলকে গ্রাম সেবার প্রতি অঙ্গীকার ও দায়বদ্ধতা বজায় রাখার ডাক দেন প্রধানমন্ত্রী।

'আয়ুষ্মান ভারত'-এর প্রস্তুতি পর্বের পর্যালোচনা করলেন প্রধানমন্ত্রী

উচ্চাকাঙ্ক্ষী স্বাস্থ্য প্রকল্প 'আয়ুষ্মান ভারত'-এর সূচনার জন্য প্রস্তুতি কেমন চলছে, তা খতিয়ে দেখলেন প্রধানমন্ত্রী।

পরিবারপিছু পাঁচ লক্ষ টাকা পর্যন্ত স্বাস্থ্য বিমার সংস্থান থাকবে এই প্রকল্পে, উদ্দেশ্য দশ কোটিরও বেশি সংখ্যক দরিদ্র ও দুর্বল শ্রেণিভুক্ত পরিবারকে এর আওতায় আনা।

এই প্রকল্পের মাধ্যমে দরিদ্র ও সমাজের প্রান্তিক গোষ্ঠীর মানুষজনদের সবচেয়ে বেশি সুবিধা দেওয়ার ওপর জোর দেন প্রধানমন্ত্রী।

গত এপ্রিল মাসে আম্বেদকার জয়ন্তী উপলক্ষে ছত্তিশগড়ের বিজাপুর জেলায় (অভিকাঙ্ক্ষী জেলা হিসেবে চিহ্নিত) প্রধানমন্ত্রী 'আয়ুষ্মান ভারত'-এর আওতায় সর্বপ্রথম 'স্বাস্থ্য ও সুস্বাস্থ্য কেন্দ্র'-এর উদ্বোধন করেন।

জুন, ২০১৮

যোজনা

পত্রিকা গোষ্ঠীর বাংলা মাসিক

ধনধান্যে

প্রধান সম্পাদক : **দীপিকা কাচ্ছাল**

উপ-অধিকর্তা : **খুরশিদ এ. মালিক**

সম্পাদক : **রমা মন্ডল**

সহ-সম্পাদক : **পম্পি শর্মা রায়চৌধুরী**

প্রচ্ছদ : **গজানন পি. ধোপে**

সম্পাদকীয় দপ্তর : ৮ এসপ্লানেড ইস্ট
কলকাতা-৭০০ ০৬৯
ফোন : (০৩৩) ২২৪৮-২৫৭৬
ই-মেল : bengaliyojana@gmail.com

গ্রাহক মূল্য : ২৩০ টাকা (এক বছরে)
৪৩০ টাকা (দু-বছরে)
৬১০ টাকা (তিন বছরে)
ওয়েবসাইট : www.publicationsdivision.nic.in
ফেসবুক : www.facebook.com/KolkataPublicationsDivision

প্রকাশিত মতামত লেখকের নিজস্ব, ভারত সরকারের নয়।

পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের বক্তব্য ও বানান আমাদের নয়।

- এই সংখ্যায় ৩
- এই সংখ্যা প্রসঙ্গে ৪

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

- ডিজিটাল প্রযুক্তি মারফত উন্নয়ন — অমিতাভ কান্ত ৫
- বিকাশের লক্ষ্যে সরকারের রণকৌশল — রাজীব আহুজা ৮
- স্বচ্ছ ভারত : স্বচ্ছতার লক্ষ্যে এক কদম — পরমেশ্বরণ আইয়ার ১১
- বর্তমান সরকারের বিদেশ নীতি : প্রতিশ্রুতি এবং উপলব্ধির চার বছর — ড. কিংশুক চট্টোপাধ্যায় ১৫
- ভারতে কর সংস্কার : সংক্ষিপ্ত ইতিহাস — টি. এন. অশোক ২১

বিশেষ নিবন্ধ

- সিদ্ধ যোগ — ড. আর. এস. রামস্বামী ২৬

ফোকাস

- নারী ও শিশু সুরক্ষা : সরকারের অগ্রাধিকার — রাকেশ শ্রীবাস্তব ২৯

অন্যান্য নিবন্ধ

- ভারতীয় অর্থনীতি : প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগের ভূমিকা — ড. তৃপ্তেন্দু প্রকাশ ঘোষ ৩৩
- ভারতের আন্তর্জাতিক পরিবেশ চুক্তি ও তাৎপর্য — ড. চন্দ্রিমা সিনহা ৩৯

নিয়মিত বিভাগ

- জানেন কি? — যোজনা ব্যুরো ৪৩
- যোজনা ক্যুইজ — সংকলন : রমা মণ্ডল, পম্পি শর্মা রায়চৌধুরী ৪৫
- যোজনা নোটবুক — —ওই— ৪৬
- যোজনা ডায়েরি — —ওই— ৪৭
- যোজনা কলাম — — ৫৭
- উন্নয়নের রূপরেখা — দ্বিতীয় প্রচ্ছদ

যোজনা
পত্রিকা গোষ্ঠীর বাংলা মাসিক
ধনধান্যে

এই সংখ্যা প্রসঙ্গে

প্রসঙ্গ উন্নয়ন কর্মযজ্ঞ

স্মরণাতীত কাল থেকেই যেকোনও সুশাসকই এই মনোবাসনা পোষণ করে এসেছেন যে তার রাজ্য যেন সর্বদা উন্নয়নের রাস্তায় এগিয়ে চলে। সে সিন্ধু সভ্যতাই হোক কিংবা মিশরীয় সভ্যতা; অথবা রোম, গ্রিস বা মেসোপটেমীয় সভ্যতা, এই একটা জায়গায় যুগে যুগে সব শাসকের মধ্যে দারুণ মিল। আরও সাম্প্রতিক যুগে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য, রাজ রাজ চোল, কৃষ্ণদেব রায়, আকবর বা টিপু সুলতান, প্রত্যেকেই নিজের রাজ্যে সুপ্রশাসন বজায় রাখার জন্য এক উত্তম প্রশাসনিক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে নাগাড়ে চেষ্টা চালিয়ে গেছেন। রাজ্যের সমৃদ্ধির জন্য জনসাধারণের সর্ব স্তরের আর্থ-সামাজিক উন্নতির গুরুত্ব এই সব শাসক ভালোমতোই উপলব্ধি করেছিলেন। আজকের দিনে জাতির সঠিক অর্থে উন্নয়ন বা বিকাশের জন্য বহু বিষয়কে বিবেচনার মধ্যে রাখতে হয়। উন্নয়ন বলতে এখন আর শুধুমাত্র কোনও রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক বাড়বৃদ্ধি বোঝায় না; শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি ও কৃষক কল্যাণ, যুবসমাজের দক্ষতার বিকাশ ও কর্মসংস্থানের সুযোগসুবিধার মতো বিভিন্ন ক্ষেত্রের খামতি মেটানোও তার মধ্যে শামিল। ভারত সরকারও বিকাশের এই সংজ্ঞা মেনেই দেশের উন্নয়ন কর্মযজ্ঞকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। আজকের দিনে রাষ্ট্রের মূলমন্ত্র, "inclusive growth", অর্থাৎ অর্থনৈতিক বৃদ্ধির প্রক্রিয়ায় দেশের আপামর জনসাধারণকে যুক্ত করা; যাতে করে উন্নয়নের সুফল হতদরিদ্র মানুষটির কাছে পর্যন্ত পৌঁছে যায়। এই বিষয়টিকে সুনিশ্চিত করতে সরকারের নীতিসমূহে বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। অর্থনীতি দিয়ে শুরু করেছে সরকার। পণ্য ও পরিষেবা কর বা জিএসটি চালু করে দেশের কর কাঠামোকে যুক্তিসঙ্গত করে তোলা; তথা ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রের সংস্কার করা হয়েছে। বলা হচ্ছে এযাবৎকালীন দেশের বৃহত্তম কর সংস্কার হল জিএসটি; দেশে কর সংগ্রহের পালে হাওয়া লাগাতে তা প্রভূত কাজে আসবে। প্রত্যক্ষ কর প্রশাসনকে জটিলতা মুক্ত করতে বেশ কিছু উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে; যার মধ্যে অন্যতম কর সংক্রান্ত তথ্য নেটওয়ার্ক (Tax Information Network বা TIN), বৈদ্যুতিন উপায়ে রিটার্ন জমার জন্য Electronic Return Acceptance and Consolidation System বা ERACS, ই-সহজ ইত্যাদি।

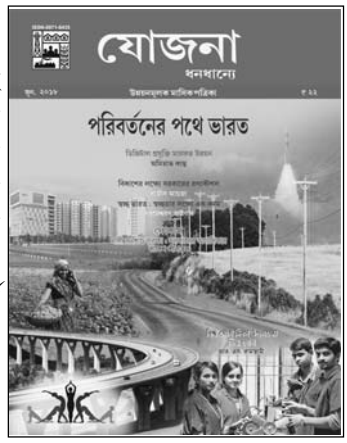

গোটা বিশ্ব দ্রুততালে ডিজিটাল জগতে প্রবেশ করছে; কাজেই ভারতও পিছিয়ে থাকতে পারে না। বহু ক্ষেত্রে দ্রুততালে ডিজিটাল প্রযুক্তি গ্রহণের মাধ্যমে, এতকাল যে পন্থায় সরকারি কর্মসূচির রূপরেখা প্রস্তুত তথা বাস্তবায়ন হ'ত, তার ধরনধারণ আমূল বদলে গেছে। ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের সাহায্য সরাসরি প্রাপ্য সুবিধা হস্তান্তর (DBT), Public Finance Managemnt System, e-marketplace, BHIM অ্যাপের মাধ্যমে বৈদ্যুতিন উপায়ে লেনদেন ইত্যাদি চালুর সূত্রে সরকার অনেক সুষ্ঠুভাবে বিভিন্ন ক্ষেত্রের কাজকর্ম চালিয়ে যেতে সক্ষম।

স্বচ্ছ ভারত মিশন এখন আক্ষরিক অর্থেই এক জন-আন্দোলনে পরিণত। সরকারের এই অতি গুরুত্বপূর্ণ ফ্ল্যাগশিপ কর্মসূচি সাড়া ফেলেছে ব্যাপক। ২০১৪ সালের ২ অক্টোবর চালু হওয়ার পর থেকে এযাবৎ গ্রাম ভারতে স্যানিটেশন সংক্রান্ত কর্মকাণ্ডের আওতায় ৭ কোটি ১ লক্ষ পরিবারে শৌচালয় তৈরি হয়েছে। অক্টোবর, ২০১৪-র ৩৯ শতাংশ থেকে দ্বিগুণ বেড়ে আজকের দিনে গ্রাম ভারতে ৮৩ শতাংশ পরিবারে শৌচালয় রয়েছে।

উন্নয়নের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা। নিজেদের সাধ্যের মধ্যে উচ্চমানের ওষুধপত্র কিনতে পারাটা গরিব মানুষের কাছে এক বিরাট সমস্যা। এর সমাধানে 'প্রধানমন্ত্রী জন ঔষধি পরিযোজনা' হাতে নেওয়া হয়েছে; গোটা দেশে এর কেন্দ্র ছড়িয়ে রয়েছে।

দেশের অসহায় জনগোষ্ঠীগুলিকে সুরক্ষা জোগানো সরকারের আশু অগ্রাধিকার। শুরুটা হয়েছিল কন্যাসন্তানের প্রতি মানুষের মানসিকতায় পরিবর্তন আনার প্রচেষ্টার মধ্যে দিয়ে। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যায়, 'বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও' এবং জেন্ডার চ্যাম্পিয়নের মতো উদ্যোগ। এছাড়াও দুর্দশাগ্রস্ত মহিলা ও শিশুদের জন্য হেল্প লাইন চালু করা, হিংসার শিকার হয়ে বেঁচে ফেরা মানুষের জন্য পুনর্বাসনের ব্যবস্থা ইত্যাদি বিবিধ কর্মোদ্যোগের মাধ্যমে সরকার সর্বদা সচেষ্ট, যাতে করে এদেশের প্রতিটি নারী ও শিশু এক ভয়মুক্ত পরিবেশে নিজেরা জীবনযাপন করতে তথা জাতির জীবনে শ্রীবৃদ্ধিতে অবদান রাখতে পারে।

জাতির বিকাশে গ্রামোন্নয়নের ভূমিকা ব্যাপক। জাতীয় খাদ্য সুরক্ষা মিশন, রাষ্ট্রীয় কৃষি বিকাশ যোজনা, প্রধানমন্ত্রী ফসল বিমা যোজনা ইত্যাদি নানা কর্মসূচির মাধ্যমে সরকার কৃষক কল্যাণ ইস্যুটির সমাধানে সচেষ্ট হয়েছে, যাতে করে অনতিবিলম্বে কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করে শহর ও গ্রামের মধ্যে আয়ের নিরিখে পার্থক্য ঘোচানো যায়।

মনে রাখতে হবে বৃদ্ধি বা বিকাশ কখনও বরাত জোরে হয় না; জোর কদমে সম্মিলিত কর্মপ্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়ার ফলপ্রাপ্তির সূত্রে আসে তা। ভারতে এক সঠিক দিশায় সম্মিলিত কর্মোদ্যোগ জোর কদমে চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে, যা শীঘ্রই জাতিকে এক নতুন দিগন্তে পৌঁছে দিতে সক্ষম হবে।❑

ডিজিটাল প্রযুক্তি মারফত উন্নয়ন

অমিতাভ কান্ত

সরকারের চালু করা বেশ কিছু ছোটো-বড়ো ই-প্রশাসন ও ডিজিটাল প্রকল্পকে পরে "ডিজিটাল ভারত" কর্মসূচির আওতায় আনা হয়েছে। ই-ক্রান্তির অধীনে ৩১-টি মিশন মোড প্রকল্প, দ্বিতীয় পর্যায়ের উন্নত জাতীয় ই-প্রশাসন পরিকল্পনার সূচনা, "মোবাইল" ও "ক্লাউড"-এর মতো নতুন প্ল্যাটফর্মের ব্যবহার বেড়ে চলার জন্য ডিজিটাল ভারত কর্মসূচির দৃষ্টিভঙ্গি বদলানোর প্রয়োজন টের পাওয়া যাচ্ছিল। এই কর্মসূচির এখন দর্শন হল "প্রশাসনে রূপান্তরের জন্য ই-প্রশাসনে পরিবর্তন ঘটানো"।

গোটা পৃথিবীটা ডিজিটাইজড হচ্ছে তরতর করে। সব ক্ষেত্রেই। তা সে, জিনিসপত্র তৈরি ও তা বিক্রিবাটা, মানুষের রোজকার জিনিসের কেনাবেচা ও নাগরিকদের কাছে সরকারের সামাজিক পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া—সব জায়গাতে ডিজিটালাইজেশনের হিড়িক। ভূরি ভূরি ডিজিটাল তথ্যের উৎপত্তি, তথ্য সংরক্ষণের খরচ কমে আসা এবং কম্পিউটার পরিকাঠামোর সৌজন্যে ডিজিটালাইজেশনের দারুন রমরমা। অধুনা, একে বলা হচ্ছে চতুর্থ শিল্প বিপ্লব। রূপান্তর ঘটাতে ডিজিটাল ভারতের ক্ষমতা সম্বন্ধে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলি সচেতন। এবং তারা কম্পিউটার প্রযুক্তি কাজে লাগাতে তৎপর হয়ে উঠেছে।

বিজনেস প্রসেস রি-ইঞ্জিনিয়ারিং, প্রযুক্তি এবং ডেটা অ্যানালিটিক্সের মাধ্যমে, গত গুটিকয়েক বছরে, ভারতে সব ক্ষেত্রে প্রশাসনের এক নতুন সংজ্ঞা ঠিক করা হয়েছে। সরকারি কর্মসূচি ছকা ও রূপায়ণে প্রযুক্তি নতুন রূপ দিচ্ছে। প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে পদ্ধতির উন্নতি হয়েছে, দক্ষতা বেড়েছে এবং প্রশাসনের ক্ষেত্রে এর বিপুল প্রভাব পড়তে শুরু করেছে।

সরকারের চালু করা বেশ কিছু ছোটো-বড়ো ই-প্রশাসন ও ডিজিটাল প্রকল্পকে পরে "ডিজিটাল ভারত" কর্মসূচির আওতায় আনা হয়েছে। ই-ক্রান্তির অধীনে ৩১-টি মিশন মোড প্রকল্প, দ্বিতীয় পর্যায়ের উন্নত জাতীয় ই-প্রশাসন পরিকল্পনার সূচনা, "মোবাইল" ও "ক্লাউড"-এর মতো নতুন প্ল্যাটফর্মের ব্যবহার বেড়ে চলার জন্য ডিজিটাল ভারত কর্মসূচির দৃষ্টিভঙ্গি বদলানোর প্রয়োজন টের পাওয়া যাচ্ছিল। এই কর্মসূচির এখন দর্শন হল "প্রশাসনে রূপান্তরের জন্য ই-প্রশাসনে পরিবর্তন ঘটানো"। এখন যাবতীয় ই-প্রশাসন প্রকল্প ই-ক্রান্তির মূল তত্ত্বগুলি অনুসরণ করে চলে। যেমন, 'ট্রান্সফরমেশন অ্যান্ড নট ট্রানশ্লেসন', 'ইন্টিগ্রেটেড সার্ভিসেস অ্যান্ড নট ইনডিভিজুয়াল সার্ভিসেস', প্রতিটি মিশন মোড প্রকল্পে 'গভর্মেন্ট প্রসেস রি-ইঞ্জিনিয়ারিং হবে আবশ্যিক", 'আইসিটি (তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি) ইনফ্রাস্ট্রাকচার অন ডিমান্ড', 'ক্লাউড বাই ডিফল্ট', 'মোবাইল ফার্স্ট', 'ফাস্ট ট্র্যাকিং এপ্রুভানস', 'ম্যানডেটিং স্ট্যান্ডার্ডস অ্যান্ড প্রোটোকলস', 'ল্যাংগুয়েজ লোকালাইজেশন', 'ন্যাশনাল জিআইসে (জিওস্পেশিয়াল ইনফরমেশন সিস্টেম)' , 'সিকিউরিটি অ্যান্ড ইলেক্ট্রনিক ডেটা প্রিজারেভশন'।

আর্থিক অন্তর্ভুক্তিতে ভারত পথ দেখাচ্ছে

এখনকার সঙ্গে সরকার আগে যেভাবে কাজ করত তার কোনও তুলনাই চলে না। কেরলে চাকরি কালে, আমি মাছচাষের ক্ষেত্রে কাজ করার অসাধারণ সুযোগ পেয়েছিলাম। আমার দায়িত্ব ছিল সাবেক মৎসজীবীদের রোজগারপাতি বাড়ানো। মাছের ব্যবসায় ফড়েদের রমরমা এবং জেলেদের বরাতে জুটতো মাছের বাজার দারের মাত্র চার আনা ভাগ।

আমরা স্বনির্ভর গোষ্ঠী গড়ে তুলি। মাছ ধরার পরিমাণ বাড়াতে এসব গোষ্ঠীকে ফাইবার

[লেখক মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিক, নিতি আয়োগ, ভারত সরকার। ই-মেল : amitabh.kant@nic.in]

গ্লাসের নৌকো, মোটরচালিত নৌকো এবং জাল দেওয়া হয়। আমরা সমুদ্রতটে মাছ নিলামের ব্যবস্থা গড়ে তুলি যাতে তাদের রোজকার ধরা মাছ বেচার টাকা তাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে জমা পড়তে পারে। জেলেদের জন্য ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট খোলাটা ছিল এক মস্ত ঝক্কির ব্যাপার। দশ মাস ধরে ব্যাঙ্কে হাঁটাহাঁটির পর অবশেষে এই কাজ করা সম্ভব হয়। কেওয়াইসি (তোমার গ্রাহককে জানো)-এর নিয়মকানুনের পালা চোকাতে কাঠখড় পোড়াতে হয়েছিল বিস্তর।

সেই দুঃস্বপ্ন ঝেড়ে ফেলে, এই তো গত মাসেই আমার অভিজ্ঞতা পুরোদস্তুর ভিন্ন। ব্যাঙ্কে ঢুকলাম, হাতে ধরা এক যন্ত্রে বায়োমেট্রিক চিহ্ন দিয়ে খুলে ফেললাম আমার অ্যাকাউন্ট। ১ মিনিটে কাজ সারা। ভাবা যায়, ১০ মাসের জায়গায় মাত্র ১ মিনিট! এ তো এক আমূল পরিবর্তন।

ই-কে ওয়াই সি, ই-সাইন, ইনস্টানটেনিয়াস পেমেন্টস (ইউপিআই) ও ফাইল স্টোরেজ (ডিজি-লকার) নিয়ে গঠিত ইন্ডিয়া স্ট্যাক সার্ভিসেসের জন্য মৌলিক তথ্য পরিকাঠামো হচ্ছে জনধন-আধার-মোবাইল এই তিনের সম্মিলন। সারা দুনিয়ায় আর্থিক অন্তর্ভুক্তি, অর্থাৎ গরিব মানুষের জন্য ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খোলা ও ব্যাঙ্ক ঋণ পাওয়ার সুযোগ সম্প্রসারণের জন্য এই ত্রয়ীর উপর সবচেয়ে বেশি নির্ভর করা হয়। বিশ্ব ব্যাঙ্ক প্রকাশিত গ্লোবাল ফিনডেক্স রিপোর্ট ২০১৭-র হিসেব, ২০১৪ থেকে ২০১৭ পর্যন্ত যত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খোলা হয়, তার

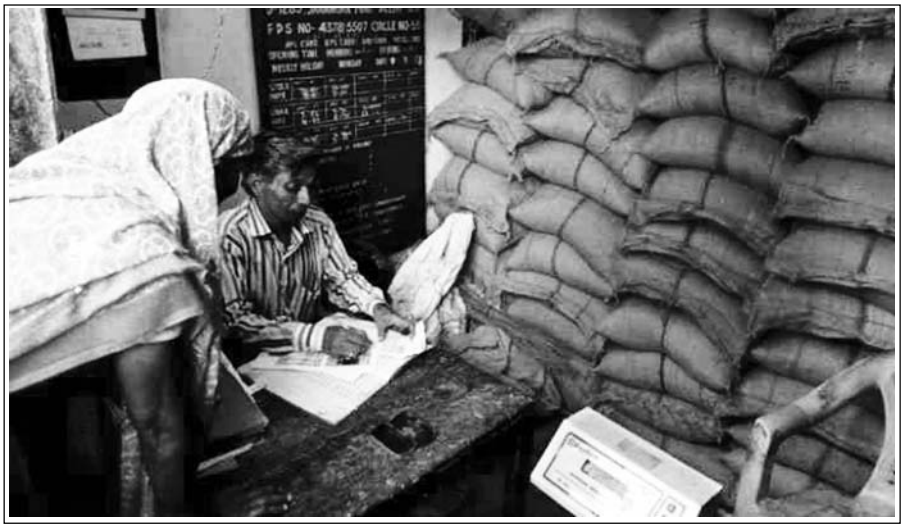

৫৫ শতাংশই খোলা হয়েছে ভারতে। প্রধানমন্ত্রী জনধন যোজনা মারফত, ২০১৪ সাল থেকে আজ অবধি ৩১ কোটির বেশি নতুন ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খোলার মাধ্যমে এখন ভারতে ৮০ শতাংশ প্রাপ্তবয়স্কের অ্যাকাউন্ট আছে। ২০১৪-এ তা ছিল ৫৩ শতাংশ।

সরকারি অর্থ ব্যবস্থা ও কেনাকাটা ডিজিটাল হচ্ছে

সরকারি অর্থ পরিচালন ব্যবস্থা (পিএফএসএস), যাবতীয় পরিকল্পনা কর্মসূচির জন্য একটি অর্থ ব্যবস্থাপনা মঞ্চ তৈরি করেছে। এছাড়া, সব এজেন্সির জন্য এক তথ্যভাণ্ডার, ব্যাঙ্কের কোর ব্যাঙ্কিং সলিউশানের সঙ্গে সংযুক্তি এবং পরিকল্পনা কর্মসূচি রূপায়ণের সর্বশেষ ধাপ অবধি টাকাকড়ির জোগানের দিকে নজর রাখার ব্যবস্থা হয়েছে। টাকা ঠিক সময়ে পাঠানো এবং তার সদ্ব্যবহারের উপরও নজর দেওয়া হচ্ছে। গত ২৮ মার্চ, ৯৮ লক্ষ লেনদেনের সূত্রে পিএফএমএস পোর্টালের মাধ্যমে ৭২ হাজার কোটি টাকার ডিজিটাল আদানপ্রদান হয়েছে। একই দিনে ডিজিটাল লেনদেনের সংখ্যায় এ এক রেকর্ড।

সাধারণের ব্যবহৃত কম দামি জিনিসপত্র ও পরিষেবা অনলাইন কেনার জন্য ২০১৬ সালে চালু হয় গভর্মেন্ট ই-মার্কেট প্লেস (জিইএম)। বেশি দামি পণ্যের (দু' লক্ষ টাকা বা তার বেশি) বৈদ্যুতিন ক্রয়ে (ই-প্রকিউরমেন্ট) সহায়তার জন্য আছে সেন্ট্রাল পাবলিক প্রকিউরমেন্ট পোর্টাল। জিইএম-এর দরুন সরাসরি কেনা, ই-বিল্ডিং, রিভার্স ই-অকশান, সরকারি সংস্থা, পণ্য বিক্রেতা, পরিষেবা জোগানদারদের অনলাইন রেজিস্ট্রি করা যায়। এবছর এপ্রিলে, জিইএম মারফত লেনদেনের অঙ্ক ৬৫০০ কোটি টাকা। এতে অংশ নেয় ২২ হাজার সরকারি ক্রেতা এবং ১ লক্ষের বেশি বিক্রেতা ও পরিষেবা প্রদানকারী। এই কেনাকাটার ৪৪ শতাংশ করা হয়েছে ক্ষুদ্র, ছোটো ও মাঝারি সংস্থা থেকে।

গ্রাহকরা ডিজিটাল উপায়ে দাম মেটানোর দিকে ঝুঁকছে

ইউনিফায়েড পেমেন্টস ইন্টারফেস (ইউপিআই) এবং ভারত বিল পেমেন্টস সিস্টেম (বিবিপিএস)-এর সুবাদে বেসরকারি ক্ষেত্রে অজস্র অ্যাপ উদ্ভাবন হয়েছে। সরকারি পরিষেবা বাবদ বিল চুকিয়ে দিতে, এমন অ্যাপ ঝক্কিঝামেলা থেকে অনেকটা রেহাই

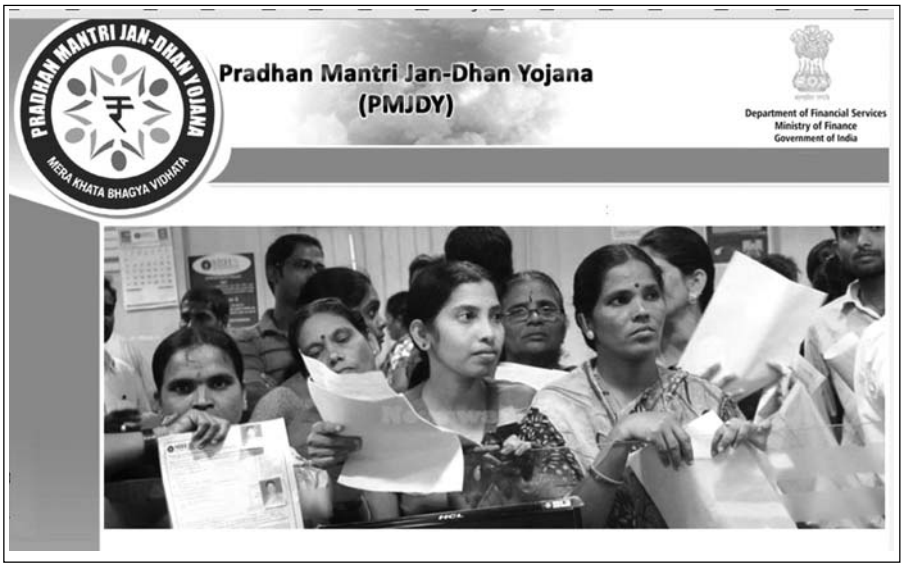

দিয়েছে গ্রাহককে। গত বছর এপ্রিলে বিবিপিএস চালু হয় পদক্ষেপমূলক হিসেবে। এখন তার তুলনায় ডিজিটাল উপায়ে বিল মেটানোর সংখ্যা বেড়েছে দ্বিগুণের বেশি। এই সময়ে, এই প্ল্যাটফর্ম মারফত বিল মেটানো টাকার অঙ্কে বৃদ্ধি পেয়েছে প্রায় ৪৬ শতাংশ। নেদারল্যান্ডসের কেএমপিবি সংস্থার প্রতিবেদন মতে, ২০১৬ সালে ভারতে বিল পেমেন্টের বাজার ছিল ৫.৮৫ লক্ষ কোটি টাকার বেশি। এর ৭০ শতাংশ মেটানো হয় নগদ বা চেকে। সংস্থার হিসেব অনুসারে, ২০২০ সালে ভারতের এই বাজার দাঁড়াবে ৯.৪ লক্ষ কোটি টাকায়।

ভারত ইন্টারফেস ফর মানি (বিএইচআইএম) ইউপিআই-র সৌজন্যে ডিজিটাল পেমেন্ট এখন খুব সহজ। আমরা দেখেছি গুগল তেজ এবং হোয়াটসঅ্যাপ পেমেন্ট। ২০১৭-'১৮-এ ভারতে ডিজিটাল পেমেন্টের সংখ্যা ছিল ১০০ কোটির বেশি, টাকার অঙ্কে যা কিনা ১ লক্ষ কোটির উপরে। এই বাজারে আরও বেশি সংস্থা এবং নয়া নয়া প্রযুক্তি ঢুকতে থাকবে। বিখ্যাত আর্থিক পরিষেবা সংস্থা ক্রেডিট সুইস প্রজেক্টস-এর রিপোর্ট, ২০২৩ সালে ভারতে এই বাজার দাঁড়াবে ১ লক্ষ কোটি মার্কিন ডলারে।

রাজস্ব ব্যবস্থার ডিজিটাল রূপান্তর

প্রত্যক্ষ কর আদায় ডিজিটাল করায় প্রচুর সুফল মিলেছে। ২০১৭-'১৮-এ ৬.৮৪ কোটি আয়কর রিটার্ন জমা পড়েছে। তার আগের বছরের তুলনায় রিটার্ন জমার পরিমাণ ১ কোটির বেশি, অর্থাৎ ২৬ শতাংশ বৃদ্ধি। ৯৮.৫ শতাংশ রিটার্ন জমা দেওয়া হয়েছে অনলাইন।

পণ্য ও পরিষেবা কর চালু হওয়ায়, পরোক্ষ করদাতার সংখ্যা আগের চেয়ে বেড়েছে ৫০ শতাংশ। সংখ্যার হিসেবে নতুন করদাতা ৩৪ লক্ষ।

ডিজিটাল পদ্ধতির মাধ্যমে প্রশাসন ও নজরদারি

প্রো-অ্যাকটিভ গভর্ন্যান্স অ্যান্ড টাইমলি ইমপ্লিমেনটেশন (প্রগতি) কর্মসূচিতে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, দ্রুত প্রকল্প রূপায়ণ সুনিশ্চিত করতে, বিভিন্ন দপ্তর এবং কেন্দ্র-রাজ্যের সীমা ঘোচাতে প্রযুক্তি কাজে

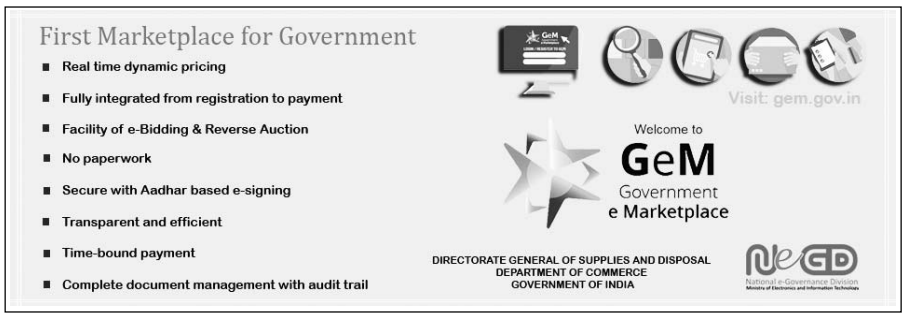

লাগিয়েছেন। সমাজকল্যাণ কর্মসূচি এবং হরেক সমস্যায় জট থাকাতে পরিকাঠামো প্রকল্পগুলি নজরদারি, খতিয়ে দেখা ও অগ্রগতি পর্যালোচনা করার জন্য তিনি সরাসরি যোগাযোগ করেছেন কেন্দ্র ও রাজ্যের পদস্থ কর্তাদের সঙ্গে। ভিডিও মারফত ২৫-টি প্রগতি বৈঠক করে প্রধানমন্ত্রী ২২৭-টি প্রকল্পে ছাড়পত্র দিয়েছেন। এসব প্রকল্পে বরাদ্দের অঙ্ক সাড়ে দশ লক্ষ কোটি টাকার বেশি।

সম্প্রতি ঘোষিত আয়ুষ্মান ভারত কর্মসূচিতে, প্রাথমিক ও সমাজ স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলিকে ডিজিটাল উপায়ে সংযুক্ত করা হবে জেলা হাসপাতালের সঙ্গে। পাঁচ লক্ষ স্বাস্থ্য বিমার পাশাপাশি, এই কর্মসূচির আওতায় আসবে ৫০ কোটি মানুষ। নথিপত্র ও নগদবিহীন এই কর্মসূচি স্বাস্থ্য পরিচর্যা সুনিশ্চিত করবে।

অত্যাধুনিক প্রযুক্তির প্রভাব

প্রখ্যাত বহুজাতিক সংস্থা অ্যাকসেন্চার-এর হিসেবে, ২০৩৫-এ কৃত্রিম বা যান্ত্রিক বুদ্ধি (আর্টিফিসিয়াল ইনটেলিজেন্স) ভারতের এখনকার মোট সংযোজিত মূল্যের ১৫ শতাংশ বৃদ্ধি করবে; অর্থাৎ ৯৫৭০০ কোটি মার্কিন ডলার। ভারতে এমন কিছু বিশেষ চ্যালেঞ্জ আছে যা কৃত্রিম বুদ্ধি প্রয়োগের মাধ্যমে সমাধান করা সম্ভব। এছাড়া, সম্প্রতি মাইক্রোসফট-ইন্টারন্যাশনাল ডেটা কর্পোরেশনের সমীক্ষা, "আনলকিং দ্যা ইকনমিক ইমপ্যাক্ট অব ডিজিটাল ট্রান্সফর্মেশন ইন এশিয়া প্যাসিফিক" জানিয়েছে, ডিজিটাল রূপান্তর ২০২১ সালে ভারতের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনে ১৫৪০০ কোটি মার্কিন ডলার যোগ করবে। ২০১৭ সালে, ক্লাউড, ইন্টারনেট অব থিংস (আইওটি) এবং কৃত্রিম বুদ্ধির মতো প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ডিজিটাল পণ্য ও পরিষেবা থেকে পাওয়া গেছে মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের প্রায় ৪ শতাংশ।

সরকার নতুন নতুন প্রযুক্তি ব্যবহার এবং সরকারি কর্মসূচি ও প্রক্রিয়ায় তা কাজে লাগানোর সম্ভাবনা খতিয়ে দেখছে। কৃত্রিম বুদ্ধি সংক্রান্ত জাতীয় কর্মসূচি তৈরির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে নিতি (এনআইটিআই) আয়োগ-কে। আয়োগ এব্যাপারে আলোচনা চালাচ্ছে বিভিন্ন মন্ত্রক, বিশেষজ্ঞ, শিল্পমহল, গবেষক ও নতুন সংস্থাগুলির সঙ্গে। প্রযুক্তির বিষয়ে জ্ঞানগম্যি লাভ, অর্থনীতি ও প্রশাসনে তার উপযোগীতা, ঝুঁকি এবং তার ভবিষ্যৎ গতিবিধি জানতে বুঝতে এটা এক ভালো প্রচেষ্টা। এছাড়া, নিতি আয়োগ সর্বাধুনিক প্রযুক্তির লাভ খতিয়ে দেখা এবং তা সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলির সামনে তুলে ধরতে, জাতীয় অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত ক্ষেত্রের নির্দিষ্ট কিছু প্রকল্পে, এসব প্রযুক্তি প্রয়োগও করছে। এগুলিকে বলা হয়েছে প্রুফ-অব-কনসেপ্ট (পিওসি) প্রকল্প। কৃত্রিম বুদ্ধি ব্যবহার করা প্রিশিসান এগ্রিকালচার, ল্যান্ডরেকর্ডস অন ব্লকচেন, অ্যাসিস্টিভ হেলথকেয়ার ডায়াগনস্টিক-এর মতো ক্ষেত্রে এগুলি পরখ করে দেখা হচ্ছে। এসব প্রকল্পের লক্ষ্য হচ্ছে, জাতীয় স্তরের প্রশাসনে হালফিলের প্রযুক্তি অবলম্বনের সম্ভাব্যতা তুলে ধরা এবং ঝুলে থাকা সমস্যা সমাধানে প্রযুক্তির কার্যকারিতা পরীক্ষা করে দেখা।

বিশাল ও সমস্যাবহুল দেশ ভারতে, বছরের পর বছর, সাধারণ মানুষ সরকারি পরিষেবা পেতে নাকাল। সব ক্ষেত্রে দ্রুত ডিজিটাল প্রযুক্তি কাজে লাগানোর দৌলতে অবস্থা বদলাচ্ছে। মানুষের ভুলচুক, গড়িমসি এড়ানো যাচ্ছে। এর এক বড়োসড়ো প্রভাব পড়ছে প্রশাসনের কার্যকারিতা এবং দক্ষতার উপর।❑

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

বিকাশের লক্ষ্যে সরকারের রণকৌশল

রাজীব আহুজা

বিশদ পর্যালোচনায় বোঝা যাবে যে, সরকার জনমোহিনী নীতি নিয়ে চলছে না। জোর দিয়েছে উন্নয়নের প্রশ্নটিকেই। সংস্কারমূলক পদক্ষেপগুলির প্রভাব পড়ছে সমাজের প্রতিটি গোষ্ঠী এবং সব বয়সের মানুষের ওপর। উন্নয়ন এবং রাজনীতির মধ্যে যতটা ভারসাম্য আনা সম্ভব তা হয়েছে। যেসব দেশে বিকাশের গতি সাধারণ মানুষের ক্রমবর্ধমান আশা-প্রত্যাশার তুলনায় অনেক পিছিয়ে, সেখানে বহু ক্ষেত্রেই সরকারের দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। এদেশের সরকার একইসঙ্গে অনেকগুলি বিষয়ে কাজ করছে। এগোনো হচ্ছে সঠিক দিশাতেই।

উন্নয়ন, ত্বরিত উন্নয়ন এবং সার্বিক উন্নয়ন : এই তিনটি মূল লক্ষ্যের ভিত্তিতে এগোচ্ছে বর্তমান সরকার। ভিন্ন প্রেক্ষাপটে বিষয়টিকে দেখলে বোঝা যাবে, উন্নয়ন কর্মযজ্ঞকে জন-আন্দোলনে পরিণত করারই বার্তা এসেছে সরকারের কাছ থেকে।

ভারতীয় রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দুতে উন্নয়নের প্রসঙ্গটিকে বর্তমান সরকার যেভাবে তুলে নিয়ে এসেছে, তা আগে কখনও হয়নি—একথা মানবেন বেশিরভাগ মানুষই। অর্থনৈতিক বৃদ্ধি এবং উন্নয়নের লক্ষ্যে হাতে নেওয়া হয়েছে বেশ কয়েকটি কর্মসূচি। প্রধানমন্ত্রী জনধন যোজনা, ডিজিটাল ইন্ডিয়া, মেক ইন ইন্ডিয়া, দক্ষ ভারত বা স্কিল ইন্ডিয়া, মুদ্রা ব্যাঙ্ক যোজনা, স্বচ্ছ ভারত অভিযান, আয়ুষ্মান ভারত—আরও কত কি? প্রশ্ন হল, গত চার বছরে বর্তমান সরকারের গৃহীত এইসব কর্মসূচি সম্পর্কে সাধারণ মানুষ কী ভাবছেন?

সাধারণ দৃষ্টিকোণ থেকে সরকারের বিভিন্ন সংস্কার বা কর্মসূচিকে অর্থনৈতিক বৃদ্ধি এবং সদর্থক পরিবর্তনের এক একটি রণনীতি বলে ভাবা যেতে পারে। এধরনের বিচারধারার কিছু সীমাবদ্ধতা থাকলেও, খুব প্রয়োজনীয় এবং গুরুত্বপূর্ণ একটি দিক এর ফলে চোখের সামনে ফুটে ওঠে। সেই প্রেক্ষাপট থেকে সরকারের উদ্যোগগুলিকে মোটামুটি তিনটি শ্রেণিতে ফেলা যায়। (১) সহজলভ্য এবং স্বল্পমেয়াদে লাভদায়ী, (২) মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদে লাভজনক, (৩) স্বল্পমেয়াদে ব্যয় ও কষ্ট সাপেক্ষ, কিন্তু ভবিষ্যতে অত্যন্ত সদর্থক প্রভাব ফেলতে সক্ষম।

প্রথম শ্রেণির মধ্যে রয়েছে চিকিৎসকের ঘাটতি মেটানোর লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য পরিষেবা ব্যবস্থায় ডাক্তারদের অবসরের বয়ঃসীমা বৃদ্ধি, কিংবা বনাঞ্চলের আওতাভুক্ত নয় এমন জমিতে কৃষির প্রসার ও কৃষকদের আয় বাড়ানোর জন্য ভারতীয় বনাঞ্চল আইনের আওতা থেকে বাঁশগাছকে সরিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত ইত্যাদি। দ্বিতীয় শ্রেণির মধ্যে পড়ে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে AIIMS-এর ধাঁচের হাসপাতাল তৈরি, বুলেট ট্রেন চালানো ইত্যাদি উদ্যোগ। তৃতীয়, তথা কাঠামোগত সংস্কারগুলির মধ্যে পড়ে পণ্য ও পরিষেবা কর বা GST চালু করা, বিমুদ্রায়ন ইত্যাদি পদক্ষেপ।

অর্থনীতিবিদের দৃষ্টিকোণ থেকে

অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞদের চোখে সরকারের আলোচ্য কর্মসূচিগুলির ব্যাখ্যা হতে পারে ভিন্নভাবে। এক্ষেত্রে বাজার অর্থনীতির ব্যর্থতা দূর করতে গৃহীত পদক্ষেপ, এবং প্রশাসনের অপারগতার মোকাবিলায় হাতে নেওয়া কর্মসূচিগুলি নিয়ে আলোচনা চলতে পারে। বাজার অর্থনীতির পক্ষে সওয়ালকারীরাও একথা মানেন যে বহু সময়েই বাজার ব্যবস্থায় সংকট দেখা দেয়; এবং তার মোকাবিলায় সরকারের হস্তক্ষেপ প্রয়োজন। সর্বজনের প্রাপ্য পণ্য ও পরিষেবা (Public goods)-র সংস্থানে সরকারের ভূমিকা অপরিহার্য। এছাড়া, বাজার ব্যবস্থায়

[লেখক উন্নয়নমূলক অর্থনীতি নিয়ে কাজ করেন। ই-মেল : ahujaahuja@yahoo.com]

নিজেদের সুবিধাজনক অবস্থানের সুযোগে যেসব বাণিজ্যিক সংস্থা অন্যায় সুবিধা নিতে তৎপর তাদের মোকাবিলা, ইতিবাচক ঘটনা বা পদক্ষেপের প্রভাব স্থায়ী করা, নেতিবাচক ঘটনার প্রভাব দূর করা, সামগ্রিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখা (macroeconomic stability), চাহিদা কম হওয়ার কারণে যেসব পণ্য বাজারে সেভাবে আসে না যেগুলির সরবরাহের ব্যবস্থা—এসব ক্ষেত্রে সরকারের উপরে নির্ভরশীলতা ছাড়া গত্যন্তর নেই।

● বাজারের খামতি বা ব্যর্থতার মোকাবিলা :

শুধুমাত্র নতুন পরিকাঠামো প্রকল্প চালু করাই নয়, থমকে যাওয়া প্রকল্পগুলির কাজ আবার শুরু করায় বর্তমান সরকার যে উদ্যোগ নিয়েছে, তা নিঃসন্দেহে প্রশংসাযোগ্য। সর্বজনের প্রাপ্য পণ্য ও পরিষেবার জোগানে বাজার ব্যবস্থার খামতি মোকাবিলায় এইসব উদ্যোগ অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। আন্তর্জাতিক সৌর জোট (International Solar Alliance)-এর প্রতিষ্ঠাতা সদস্যের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে বিশ্বের সকল দেশের মানুষের প্রাপ্য পণ্য ও পরিষেবার (global public goods) জোগানেও নিজের দায়বদ্ধতা এবং সদিচ্ছার নজির রেখেছে এই সরকার।

ডিজিটাল লেনদেন বাড়ানো, জাতীয় পুষ্টি অভিযান (National Nutrition Mission) আরও জোরদার করা, স্বচ্ছ ভারত অভিযানের মতো পদক্ষেপের ইতিবাচক প্রভাব স্থায়ী করা সরকারের লক্ষ্য। অন্যদিকে, ভারত পর্যায় নির্গমন বিধি (Bharat Stage emission norms)-কে চতুর্থ থেকে ষষ্ঠ স্তরে নিয়ে যাওয়া, যানবাহনজনিত পরিবেশ দূষণের নেতিবাচক প্রভাব কমানোর প্রয়াস, অক্সিটোসিন (oxytocin) আমদানি বা বিক্রির ওপর নিষেধাজ্ঞার সিদ্ধান্ত সম্পর্কেও এই কথা খাটে।

বাজার ব্যবস্থার খামতি মেটাতেও সরকার উদ্যোগী হয়েছে। আর্থিক অন্তর্ভুক্তির (Financial inclusion) লক্ষ্যে হাতে নেওয়া হয়েছে প্রধানমন্ত্রী জনধন যোজনা। কম আয়ের মানুষজনের ক্ষেত্রে গৃহঋণে ভরতুকির লক্ষ্যে চালু করা হয়েছে সকলের জন্য আবাস কর্মসূচি। বৃত্তিমূলক তথা প্রযুক্তিগত প্রশিক্ষণের প্রসারে গৃহীত দক্ষ ভারত (Skill

India) মিশন সম্পর্কেও একথা প্রযোজ্য। সার্বিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার প্রশ্নে অর্থনৈতিক বৃদ্ধির হার একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। অর্থনৈতিক বৃদ্ধি বজায় রাখার লক্ষ্যে হাতে নেওয়া হয়েছে বেশ কয়েকটি কর্মসূচি। কৃষি উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বাড়াতে চালু হয়েছে প্রধানমন্ত্রী কৃষি সিঁচাই যোজনা, মৃত্তিকা স্বাস্থ্য কার্ড (Soil Health Card), ফসল বিমা যোজনার মতো প্রকল্প। ক্ষুদ্র উদ্যোগপতি বা উদ্ভাবকদের কাছে ব্যাঙ্ক ঋণ সহজলভ্য করে তুলতে সরকার চালু করেছে মুদ্রা যোজনা, স্টার্ট আপ ইন্ডিয়া, স্ট্যান্ড আপ ইন্ডিয়ার মতো কর্মসূচি।

২০২২-এর মধ্যে কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করা সরকারের অন্যতম লক্ষ্য। আগামী তিন বছরে ভারতে আসা বিদেশি পর্যটকের সংখ্যা দ্বিগুণ করা, ২০২২ সাল নাগাদ সৌরবিদ্যুতের উৎপাদন ১০০ গিগাওয়াটে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যমাত্রাও রেখেছে সরকার। অর্থনৈতিক বৃদ্ধির প্রশ্নে গৃহীত পদক্ষেপগুলির দিকে তাকালে বোঝা যাবে সরকার এক্ষেত্রে নতুন নতুন উৎসমুখ খুঁজে বের করার পাশাপাশি সমাজের সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে থাকা সম্ভাবনাকেও কাজে লাগাতে চায়। এই বিষয়টিকে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের গণতন্ত্রীকরণ বলা যেতে পারে।

বাজার ব্যবস্থার খামতির পাশাপাশি সরকারের সীমাবদ্ধতার বিষয়টিও সমান গুরুত্বপূর্ণ। বাজারের ব্যর্থতাপূরণে সরকার ব্যর্থ হতে পারে। আবার, নিজের মূল দায়িত্ব যেসব ক্ষেত্রে; যেমন, দারিদ্র্য দূরীকরণ, সমতা বিধান—সেখানেও অপারগ হতে পারে সরকার।

● সরকারি বা প্রশাসনিক ব্যর্থতার মোকাবিলা :

বাজার অর্থনীতির ক্ষেত্রে, সরকারের অন্যতম দায়িত্ব হল বাজার ব্যবস্থা যাতে সুচারুভাবে কাজ করে, সেজন্য প্রয়োজনীয় নিয়ন্ত্রণ এবং কিছু মানদণ্ড বজায় রাখা। এই লক্ষ্যে নতুন নতুন নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষ তৈরি করার সংস্থান রয়েছে। চালু নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপত্রগুলিকেও আরও শক্তিশালী করা হচ্ছে।

নির্মাণ ক্ষেত্রের কথাই ধরা যাক। ক্রেতাদের স্বার্থরক্ষায় এবং লেনদেনে স্বচ্ছতার লক্ষ্যে গৃহীত হয়েছে আবাসন আইন (Real Estate Act)। ঠিক একই উদ্দেশ্যে খাদ্য, ব্যাঙ্কিং প্রভৃতি ক্ষেত্রেও নিয়ন্ত্রণ আরও জোরদার করা হয়েছে। পেশাদারদের দায়বদ্ধতা ও নৈতিকতার প্রশ্নে, চিকিৎসক, হিসাবরক্ষক, হিসাব পর্যবেক্ষকদের কাজকর্মের ওপর রাখা হচ্ছে সতর্ক দৃষ্টি। সামাজিক বিভিন্ন ক্ষেত্রেও নজরদারি বাড়ানো হয়েছে। স্বাস্থ্যক্ষেত্রে কোনও নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষ না থাকায় ওষুধ এবং চিকিৎসা সরঞ্জামের বাজার ব্যবস্থায় বড়ো ধরনের গলদ একাধিকবার প্রকট হয়ে উঠেছে। ঘুষ এবং অবৈধ

লেনদেনের সমস্যা ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে বারবার। বিষয়টি নজরে এসেছে সরকারের। নেওয়া হচ্ছে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা।

রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলির কাজকর্মে গতি আনতে বিপুল বিলগ্নীকরণের লক্ষ্য নিয়েছে সরকার নিজেই। পরিবর্তনশীল অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে নিজেদের মানিয়ে নিতে এইসব সংস্থাকে নতুন করে সেজে ওঠায় উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে। উদাহরণ হিসেবে এখানে ভারতীয় ডাক পেমেন্টস ব্যাঙ্ক-এর প্রসঙ্গ তোলা যেতে পারে। দেশের প্রায় দেড় লক্ষ ডাকঘর এই প্রকল্পে শামিল হতে চলেছে। রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলির কাজে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ রুখতেও প্রয়াসী সরকারি।

'ন্যূনতম আয়তনের সরকার—সর্বোত্তম প্রশাসন' (Minimum Government, Maximum Governance)-এর আদর্শকে সামনে রেখে ডিজিটাল প্রযুক্তির ওপর অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে এখন। এর ফলে জনপরিষেবা পাওয়ার ক্ষেত্রে দেশের মানুষকে সরকারি কর্তাব্যক্তিদের দরজায় দরজায় ঘুরে বেড়াতে হবে না। জীবনযাত্রা আরও সহজ হবে। তৈরি হবে বাণিজ্যবান্ধব পরিবেশ।

● **সমতাবিধান :**

এই লক্ষ্যে সরকার হাতে নিয়েছে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি। এর অনেকগুলি ভৌগোলিক অঞ্চলভিত্তিক। অন্যগুলি আবার জনগোষ্ঠীভিত্তিক। দীর্ঘদিন ধরে অবহেলা ও বঞ্চনার শিকার উত্তর-পূর্বাঞ্চলের উন্নয়নে বিশেষ জোর দেওয়া হচ্ছে এখন। এজন্য হাতে নেওয়া হয়েছে নানা প্রকল্প। ঠিক একইভাবে অর্থনৈতিক বিচারে দেশের পিছিয়ে পড়া ১০০-টি জেলাকে চিহ্নিত করে তাদের উন্নয়নে নেওয়া হচ্ছে বিশেষ উদ্যোগ।

দায়িত্বগ্রহণের হাজার দিনের মধ্যে দেশের সব গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়ার স্বপ্ন ছিল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর। এবার, প্রতিটি পরিবারে বিদ্যুৎ পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

মহিলা ও শিশুদের স্বাস্থ্যের উন্নয়নে উজ্জ্বলা যোজনার আওতায় দারিদ্র্যসীমার নিচে থাকা পরিবারগুলিতে নিঃখরচায় রান্নার গ্যাস সংযোগ দেওয়া হচ্ছে। দরিদ্র মানুষের

হাসপাতালে চিকিৎসার ভার লাঘব করতে চালু হচ্ছে জাতীয় স্বাস্থ্য সুরক্ষা প্রকল্প। এসবই হল সমতাবিধানের লক্ষ্যে গৃহীত জনগোষ্ঠীভিত্তিক কর্মসূচির উদাহরণ।

সুপ্রশাসন এবং বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় প্রদেয় ভরতুকি বা নগদ প্রদানের ক্ষেত্রে টাকার নয়ছয় রুখতে চালু হয়েছে সরাসরি সুবিধা হস্তান্তর প্রক্রিয়া বা DBT। প্রদেয় অর্থ সরাসরি চলে যাচ্ছে প্রাপকের নিজের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে।

অন্য চিন্তাধারা

বাজার ব্যবস্থার ব্যর্থতা মোকাবিলা এবং সমতাবিধানের লক্ষ্য অর্জনে আচরণভিত্তিক অর্থশাস্ত্র সরকারের নতুন ধরনের ভূমিকার কথা বলে। এখানে মানুষের আচরণ এবং পছন্দের বিষয়টিকে প্রভাবিত করতে সরকারের উদ্যোগকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। বিভিন্ন বিষয়ে সামাজিক বার্তা দিয়ে নাগরিক মনকে প্রভাবিত করা সরকারের কাজের মধ্যে পড়ে। শিশুকন্যার সামাজিক অবস্থানগত উন্নয়ন বা গ্রামীণ এলাকাকে প্রকাশ্যে শৌচকর্মহীন করে তোলার প্রয়াস এধরনের উদ্যোগেরই অঙ্গ।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এক্ষেত্রে তার বাকপটুতাকে কাজে লাগাতে দ্বিধা করেননি। সুস্থ থাকার ক্ষেত্রে যোগাভ্যাসের গুরুত্ব, খাদি কর্মীদের আয় নিশ্চিত করতে খাদিবস্ত্র ব্যবহারে জোর দেওয়া, কম আয়ের মানুষজনের সুবিধার্থে বেশি উপার্জনকারীদের রান্নার গ্যাসের ভরতুকির সুযোগ না নিতে উদ্বুদ্ধ করা, বিদ্যুতের সাশ্রয়ে LED বালবের ব্যবহারের প্রসার—সব বিষয়েই তার মতামত জানিয়েছেন বার বার।

উন্নয়ন বিষয়টিকে সুস্থ রাজনীতির ভরকেন্দ্র করে তোলা

কেবল কয়েকটিমাত্র উদাহরণ এই নিবন্ধে দেওয়া হয়েছে। সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ এবং সংস্কার উদ্যোগের তালিকা আরও অনেক দীর্ঘ।

বিশদ পর্যালোচনায় বোঝা যাবে যে, সরকার জনমোহিনী নীতি নিয়ে চলছে না। জোর দিয়েছে উন্নয়নের প্রশ্নটিকেই। সংস্কারমূলক পদক্ষেপগুলির প্রভাব পড়ছে সমাজের প্রতিটি গোষ্ঠী এবং সব বয়সের মানুষের ওপর। উন্নয়ন এবং রাজনীতির মধ্যে যতটা ভারসাম্য আনা সম্ভব তা হয়েছে।

যেসব দেশে বিকাশের গতি সাধারণ মানুষের ক্রমবর্ধমান আশা-প্রত্যাশার তুলনায় অনেক পিছিয়ে, সেখানে বহু ক্ষেত্রেই সরকারের দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। এদেশের সরকার একইসঙ্গে অনেকগুলি বিষয়ে কাজ করছে। এগোনো হচ্ছে সঠিক দিশাতেই। কিন্তু সেই সংস্কার প্রক্রিয়ার গতি নির্ভর করে অনেকগুলি বিষয়ের ওপরে। সরকারের ক্ষমতা ও দক্ষতার প্রশ্নটি এক্ষেত্রে খুব বড়ো। স্বার্থান্বেষী নানা মহল সংস্কারের কাজে বাধা সৃষ্টি করে প্রায়শই।

সংস্কার কর্মযজ্ঞের পর্যালোচনায় সঠিক দৃষ্টিভঙ্গির অন্বেষণই এই নিবন্ধের মূল বিষয়। রূপায়ণের প্রশ্নটি ভিন্নতর। তাই সংস্কার প্রক্রিয়ার গতি নিয়ে এখানে কিছু বলা হচ্ছে না। সেই বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং সেজন্য অন্য সময়ে আলাদা নিবন্ধে আলোচনা হতে পারে।❑

স্বচ্ছ ভারত : স্বচ্ছতার লক্ষ্যে এক কদম

পরমেশ্বরণ আইয়ার

স্বচ্ছ ভারত মিশন শুধুমাত্র শৌচালয় নির্মাণের গণ্ডি ছাড়িয়ে মানুষের অভ্যাস তথা মানসিকতা পরিবর্তনের ভিত গড়ে দিচ্ছে। এই পরিবর্তন যে কতটা জরুরি, প্রধানমন্ত্রী বার বার সেই প্রসঙ্গ টেনে এনেছেন, স্বচ্ছ ভারত মিশন (গ্রামীণ) সংক্রান্ত তার বিবিধ ভাষণে। ২০১৬ সালে এমনই এক ভাষণে প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন, "পরিচ্ছন্নতা এমন একটা জিনিস, বাজেট বরাদ্দের মাধ্যমে তা অর্জন করা সম্ভব নয়; মানুষের অভ্যাসে পরিবর্তনের দৌলতেই এই সমস্যার সমাধান সম্ভব। একে এক গণআন্দোলনের চেহারা দিতে হবে"। পরিচ্ছন্ন ভারত গড়ার স্বপ্ন সাকার করার প্রশ্নে মানুষের অভ্যাস ও মানসিকতার পরিবর্তন যেমন এক আবশ্যিক শর্ত; আবার তেমনি তা আরেক অর্থে বৃহত্তম চ্যালেঞ্জও বটে।

নির্মল পানীয় জল এবং নিরাপদ সাফসুতরো শৌচের ব্যবস্থা এক সুস্থসবল জনসংখ্যার মৌলিক শর্ত। সার্বিক মানব-সম্পদ বিকাশের কেন্দ্রেও তাই ঠাঁই পেয়েছে তা। প্রতি বছর, গোটা বিশ্বজুড়ে লক্ষ লক্ষ মানুষ, যাদের মধ্যে অধিকাংশই আবার শিশু, নির্মল জলের জোগানের সংকট এবং সঠিক শৌচ ব্যবস্থা ও স্বাস্থ্যবিধির অভাবে বিভিন্ন রোগব্যাধির সূত্রে মারা পড়ে। সুস্থভাবে বেঁচেবর্তে থাকার জন্য নির্মল পানীয় জল এবং সুরক্ষিত শৌচের ব্যবস্থা অত্যন্ত জরুরি। এর অনুপস্থিতি সারা বিশ্বেই মানুষের স্বাস্থ্য, খাদ্য সুরক্ষা এবং পরিবারের জীবিকার উপর প্রতিকূল প্রভাব ফেলে। বিগত কয়েক দশকেরও বেশি সময় ধরে একের পর এক সরকার স্যানিটেশন বা শৌচ ব্যবস্থা সংক্রান্ত প্রচারাভিযান চালিয়ে এসেছে মানুষের জীবনের এক প্রাথমিক প্রয়োজন তথা অন্যতম মানবাধিকার হিসাবে। এইসব প্রচারাভিযানে সুরক্ষিত শৌচ বিধিব্যবস্থার বিভিন্ন দিক নিয়ে কর্মকাণ্ড চালানো হয়েছে। যেমন কিনা, উন্মুক্ত স্থানে শৌচকর্মের রীতি বর্জন বা ODF (Open Defecation Free) তকমা অর্জন; ঋতুকালীন স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনা (Menstrual Hygiene Management বা MHM), অর্থাৎ ঋতুচক্রের সময় মহিলা ও বয়ঃসন্ধির কিশোরীরা যেন প্রয়োজনীয় ন্যাপকিন, সাফসুতরো থাকার জন্য পর্যাপ্ত জল ও সাবানের নাগাল পান তথা ব্যবহৃত ন্যাপকিনের মতো বর্জ্য সঠিক রীতি মেনে অপসারণের সুযোগ পান তার বন্দোবস্ত ইত্যাদি। তবে এর মধ্যে স্বচ্ছ ভারত অভিযানকে কিন্তু এক কথায় অভূতপূর্ব উদ্যোগ বলা চলে। কারণ, তা হল মানুষের মজ্জাগত অভ্যাস ও মানসিকতায় পরিবর্তন আনার জন্য গোটা বিশ্বের মধ্যে এযাবৎকালীন বৃহত্তম প্রচারাভিযান। সর্বত্র শৌচালয় তৈরি ও সঠিক রীতি মেনে তার ব্যবহারে জনগোষ্ঠীগুলিকে উদ্বুদ্ধ করা, তরল ও কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উপর নজর দেওয়া ইত্যাদি কর্মযজ্ঞের সূত্রে গ্রামীণ ভারতে মানুষের জীবনযাপনের মানে সাধারণভাবে উন্নতিসাধন করে আগামী ২০১৯ সালের মধ্যে এক পরিচ্ছন্ন সাফসুতরো দেশ, অর্থাৎ "স্বচ্ছ ভারত" গড়ে তোলাই এই কর্মসূচির উদ্দেশ্য।

মহাত্মা গান্ধীর সার্ধশততম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপনকে স্মরণীয় করে রাখতে বিগত ২০১৪ সালে স্বাধীনতা দিবসের শুভক্ষণে ঐতিহাসিক লালকেল্লার প্রাঙ্গণ থেকে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আগামী ২০১৯ সালের ২ অক্টোবর তারিখের মধ্যে পরিচ্ছন্ন ভারত গড়ে তুলতে জাতির উদ্দেশ্যে আহ্বান জানান। এক মাইলফলক সদৃশ এই ঘোষণার মাধ্যমে শুরু হয় ভারতের এক অতুল্য যাত্রা। বিশ্বের এযাবৎকালীন বৃহত্তম স্যানিটেশন কর্মসূচি, স্বচ্ছ ভারত মিশনের সংকল্প, ২০১৯ সালের অক্টোবর মাসের মধ্যে এক সাফসুতরো এবং উন্মুক্ত স্থানে শৌচকর্মের রেওয়াজবিহীন বা ODF তকমাযুক্ত ভারত। যা এক কথায় ইতিহাসে অভূতপূর্ব বলা যেতে পারে। এই মিশন প্রথম যখন চালু হয়, গোটা দেশে ৫৫ কোটির মতো মানুষ শৌচকর্মের প্রয়োজনে যত্রতত্র মাঠেঘাঠে

[লেখক সচিব, কেন্দ্রীয় পানীয় জল ও স্বাস্থ্যবিধান মন্ত্রক, ভারত সরকার। ই-মেল : param.iyer@gov.in]

যেতেন, এবং সেটাই ছিল স্বাভাবিক রীতি। আর আজকের দিনে এসে আমরা দেখছি এই সংখ্যাটা অনেকটা কমে দাঁড়িয়েছে মোটামুটি ২০ কোটিতে। গোটা দুনিয়াতেই কোনও একটি সরকারের শীর্ষ নেতৃত্বের তরফে পরিচ্ছন্নতা এবং স্যানিটেশনের প্রশ্নে এমনতরো উচ্চাশাবাদী এবং জোরালো ঘোষণা এর আগে করা হয়েছে কিনা; তথা জাতীয় নীতি ও বিকাশের সামনের সারিতে মধ্যমণি হিসাবে স্যানিটেশন ঠাঁই করে নিয়েছে কিনা, তা নিয়ে বিতর্কের অবকাশ রয়েছে। তবে একুশ শতকের ভারত, যে কিনা বিশ্ব অর্থনীতিতে 'সুপার পাওয়ার' বা মহাশক্তিধর হয়ে ওঠার পথে বেশ কয়েক কদম ইতোমধ্যেই এগিয়ে গেছে, সেই ভারতের বুকে নোংরা জঞ্জাল বা মাঠেঘাটে যত্রতত্র শৌচকর্মের কোনও স্থান থাকতে পারে না। স্যানিটেশন ও পরিচ্ছন্নতার লক্ষ্যে হাতে নেওয়ার কর্মযজ্ঞকে জাতীয় অগ্রাধিকারে পরিণত করতে আমাদের প্রধানমন্ত্রী তার রাজনৈতিক পুঁজিকে কাজে লাগানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। আর পূর্ববর্তী এধরনের সমস্ত সরকারি প্রকল্পের সঙ্গে স্বচ্ছ ভারত মিশনের পার্থক্য গড়ে দিয়েছে মূলত এই বৈশিষ্ট্যটিই।

২০১৪ সালের ২ অক্টোবর তারিখের পর থেকে এযাবৎ ৭ কোটি ১ লক্ষের বেশি পরিবারে শৌচালয় তৈরি হয়েছে। এর সোজা অর্থ হল, গ্রাম ভারতে শৌচালয় সমেত বাড়ির সংখ্যা, ২০১৪ সালের অক্টোবর মাসের ৩৯ শতাংশের থেকে দ্বিগুণের অধিক বেড়ে আজকের দিনে ৮৩ শতাংশ ছাড়িয়ে গেছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে হিসাব করলে দেখা যাচ্ছে, স্বাধীনতার পর দীর্ঘ ৬৭ বছর ধরে দেশে স্যানিটেশন ব্যবস্থার যে প্রসার ঘটেছে, বিগত মাত্র সাড়ে তিন বছরে তার থেকে অনেক বেশি অগ্রগতি পরিলক্ষিত হয়েছে। গোটা দেশে ৩ কোটি ৬ লক্ষের বেশি গ্রাম, ৩৮২-টি জেলা, ১৩-টি রাজ্য (অরুণাচল প্রদেশ, ছত্তিশগড়, গুজরাট, হরিয়ানা, হিমাচল প্রদেশ, কেরালা, মহারাষ্ট্র, মেঘালয়, মিজোরাম, পাঞ্জাব, রাজস্থান, সিকিম ও উত্তরাখণ্ড) এবং ৪-টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল (আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, চণ্ডীগড়, দমন ও দিউ এবং দাদরা ও নগর হাভেলি) ইতোমধ্যেই উন্মুক্ত শৌচের রেওয়াজবিহীন বা ODF তকমা পেয়েছে। গোটা দেশকে এই খেতাবের দাবিদার হয়ে উঠতে হলে, ২০১৯ সালের ২ অক্টোবরের মধ্যে স্বচ্ছ ভারতের সংকল্প অনুযায়ী গ্রাম ভারতের প্রতি ঘর-পরিবারে শৌচালয় তৈরি করে দেওয়ার/থাকার বন্দোবস্ত করতে হবে। স্বচ্ছ ভারত মিশন-গ্রামীণের জন্য লাগাতার জোর কদমে কাজকর্ম চালিয়ে যাওয়ার দৌলতে এবিষয়ে বিশেষ অগ্রগতি চাক্ষুষ করা যাচ্ছে। বিগত কয়েক বছর যাবৎ সংশ্লিষ্ট মিশনের কিছু বৈশিষ্ট্যই স্বচ্ছ ভারত মিশনকে স্যানিটেশন বিষয়ক আগেকার যাবতীয় কর্মসূচির থেকে পৃথক বলে চিহ্নিত করেছে। গতানুগতিক দৃষ্টিভঙ্গি ত্যাগ করে এই মিশন তাই পরিবর্তনের এক নতুন রাস্তায় পা রেখেছে। প্রথমেই উল্লেখ করা যায় যে, শুরু থেকেই প্রশাসনের একদম শীর্ষ স্তর থেকে নিরবচ্ছিন্ন পৃষ্ঠপোষকতা-সহ এই কর্মসূচি পরিচালিত হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং মিশনের মুখ্য প্রচারকের/সংযোজকের দায়িত্ব পালন করে আসছেন। স্যানিটেশন কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষকে মিশনের সাথে যুক্ত করে তথা একে স্রেফ এক সরকারি কর্মসূচির গণ্ডি ছাড়িয়ে, সাধারণ মানুষের কর্মকাণ্ড হিসাবে চিহ্নিত করে তিনি স্যানিটেশন বিষয়ে এক নতুন ধারণা গড়ে দিয়েছেন। দেশের প্রতিটি প্রান্তে, প্রতিটি মানুষের দুয়ারে পৌঁছে যেতে কোন পথে এগোতে হবে তার নকশা নির্মাণের সময়কালে এই কর্মকাণ্ডের ব্যাপকতার কথা ভাবনাচিন্তা করে যেসব উদ্যোগ নেওয়া হয়, তার উপর ভিত্তি করেই বর্তমান রূপ পেয়েছে এই মিশন। কাজের গতি মসৃণভাবে সচল রাখা তথা সর্ব স্তরের মধ্যে সমানতালে যোগাযোগ অটুট রাখার জন্য মিশনের সঙ্গে জড়িত বিভিন্ন পক্ষের পাশাপাশি, রূপায়ণকারী তরফ, অর্থাৎ রাজ্য ও জেলাগুলির মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগ এবং মিশনের উপর নিরবচ্ছিন্ন খবরদারি অত্যন্ত জরুরি। যে গতিতে কাজ এগোচ্ছে, এবং এই 'জন-আন্দোলন' দিন দিন যেভাবে শক্তিশালী হচ্ছে, তাতে করে সঠিক মানের শৌচালয় নির্মাণ এবং পারিবারিক স্তরে এই শৌচালয়ের সঠিক রীতি মেনে ব্যবহার সুনিশ্চিত করাটা মন্ত্রকের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হয়ে দাঁড়িয়েছে। এজন্য, স্বচ্ছ ভারত মিশন (গ্রামীণ)-এর ক্ষেত্রে মন্ত্রক এক ব্যাপকতর আকারের পাকাপোক্ত অনলাইন প্ল্যাটফর্ম বা মঞ্চকে কাজে লাগাচ্ছে। ২০১২-'১৩ সালে চালানো বেসলাইন সমীক্ষার ভিত্তিতে প্রাপ্ত দেশের সমস্ত গ্রামে বসবাসকারী পরিবারগুলির শৌচালয়ের সুযোগসুবিধা সংক্রান্ত তথ্য-পরিসংখ্যান বা ডেটা রাজ্য সরকারগুলির তরফে পরিচালন তথ্যভাণ্ডার ব্যবস্থায় (Management Information System বা MIS) মজুত রাখা হয়েছে। এই বিপুল কর্মযজ্ঞে দুর্নীতির মাত্রা কমাতে এবং কাজের দায়বদ্ধতা বাড়াতে মন্ত্রক তৃতীয় পক্ষের সাহায্য নেয়। অন্য সংস্থার দ্বারা পরিচালিত জাতীয় নমুনা সমীক্ষার মাধ্যমে মন্ত্রক গ্রামীণ ভারতের স্যানিটেশনের হালহকিকত খতিয়ে দেখছে। Quality Council of India (QCI) ২০১৭ সালের মে-জুন মাসে

চিত্র-১
১৯৮১ সালের আদমশুমারির সময় থেকে ভারতে স্যানিটেশন ব্যবস্থার খতিয়ান

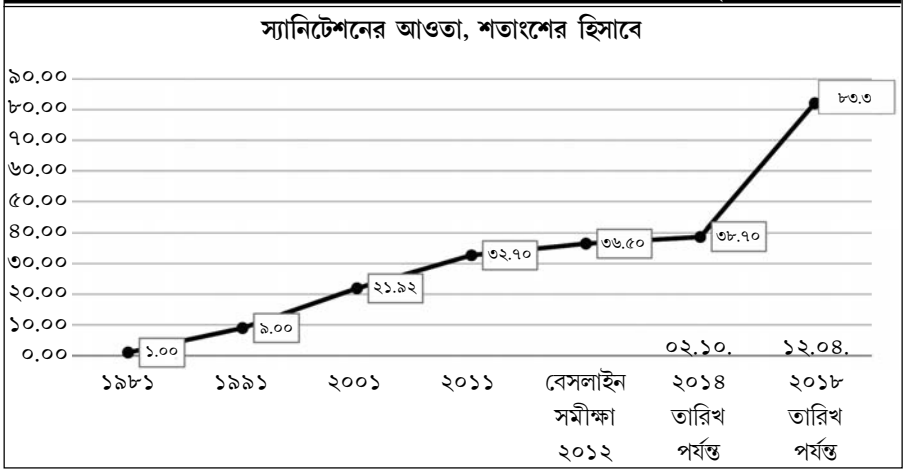

দেশজুড়ে বিক্ষিপ্তভাবে ৪৬২৬-টি গ্রামের ১ লক্ষ ৪০ হাজার পরিবারকে বাছাই করে এক সমীক্ষা চালায়। এই সমীক্ষাতেই উঠে আসে শৌচালয়ের ব্যবহার বেড়ে ৯১.২৯ শতাংশে পৌঁছেছে। এমনকি আরও সম্প্রতি, স্বচ্ছ ভারত মিশন (গ্রামীণ) সম্পর্কিত বিশ্ব ব্যাঙ্কের সহায়তা পোষিত প্রকল্পের আওতায় পরিচালিত হয়েছে বার্ষিক গ্রামীণ স্যানিটেশন সমীক্ষা (National Annual Rural Sanitation Survey বা NARSS), ২০১৭-'১৮। এই নমুনা সমীক্ষার ক্ষেত্রে বেছে নেওয়া হয়, দেশজুড়ে ৬ হাজার ১৩৬ গ্রামের ৯২ হাজারেরও বেশি পরিবারকে। স্বাধীন যাচাই সংস্থা (Independent Verification Agency বা IVA) তাদের বক্তব্য ও মতামত NARSS-এ উঠে আসা খামতিগুলি দেখার জন্য গঠিত বিশেষজ্ঞ পর্যালোচনা কমিটি (Expert Working Group বা EWG)-র কাছে উপস্থাপন করেছে। বিশ্ব ব্যাঙ্ক, UNICEF, Water Aid, Bill & Melinda Gates Foundation, India Sanitation Coalition, Sulabh International, Knowledge Links, NITI আয়োগ এবং কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান ও কর্মসূচি রূপায়ণ মন্ত্রক থেকে প্রতিনিধিদের বেছে নিয়ে এই কমিটি গঠিত হয়েছে। কমিটি খতিয়ে দেখেছে যে সমীক্ষার ফলাফল বেশ সন্তোষজনক, ৯৩.৪০ শতাংশ শৌচালয় ব্যবহার হচ্ছে বলে যে দাবি করা হয়েছে, তা মোটের উপর সঠিক। ODF তকমার দাবি যাচাই করা গ্রামগুলির মধ্যে ৯৫.৬ শতাংশের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সমীক্ষা সিলমোহর দিয়েছে।

শৌচালয় ব্যবহারের রেওয়াজ বাড়ানো এবং উন্মুক্ত স্থানে শৌচকর্মের অভ্যাস কমানো এই দু'টি বিষয় স্বচ্ছ ভারত মিশন (গ্রামীণ)-এর ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ সূচক। উল্লেখ করা যেতে পারে, মানুষের মাত্র এক গ্রাম বিষ্ঠাতেই ১০ লক্ষ ভাইরাস, ১ লক্ষ ব্যাকটেরিয়া এবং ১ হাজার পরজীবী সিস্ট থাকে। কাজেই, যতক্ষণ পর্যন্ত না গ্রামগুলি পুরোদস্তুর ODF হয়ে উঠতে পারছে, বিষ্ঠাবাহিত জীবাণু খাদ্য-পানীয়ের মাধ্যমে মানুষের শরীরে প্রবেশের চক্র সক্রিয় থাকবে। অতএব, এক সুস্থসবল ভবিষ্যতের রাস্তায় পা রাখতে গেলে একক প্রচেষ্টায় সুফল মিলবে না, গোটা জনগোষ্ঠীকে অবশ্য করে একজোট হয়ে কাজ করতে হবে এবং নয়া অভ্যাস গড়ে তুলতে স্থিরপ্রতিজ্ঞ হতে হবে।

বিগত মাত্র দু'-চার বছরেই তৃণমূল স্তরে স্বাস্থ্য ও অর্থনীতি, এই দু'টি ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সুফল মিলতে দেখা গেছে স্বচ্ছ ভারত মিশনের দৌলতে। তাদের 'The Financial and Economic Impact of SBM in India (2017)' শীর্ষক এক রিপোর্টে UNICEF হিসাব কষে দেখিয়েছে, ভারতের ODF তকমাপ্রাপ্ত গ্রামগুলির একেকটি পরিবার বছরে ৫০ হাজার টাকা অনাবশ্যক খরচের হাত থেকে বেঁচে যাচ্ছে। Bill & Melinda Gates Foundation প্রকাশিত আরেকটি সমীক্ষাপত্রের তথ্য-পরিসংখ্যান বা ডেটা দেখাচ্ছে, অন্যান্য মাপকাঠিতে সমমানের হলেও শুধুমাত্র ODF সূচকই গ্রামগুলির মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য গড়ে দিচ্ছে। শিশুদের মধ্যে পেটের রোগ বা ডায়েরিয়ার প্রাদুর্ভাব ও তা নিয়ন্ত্রণের প্রশ্নে ODF গ্রামগুলিতে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। গ্রাম ভারতকে উন্মুক্ত স্থানে শৌচকর্মের রেওয়াজ বর্জিত করার এই গোটা আন্দোলনটাই এগিয়ে চলেছে সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণের সূত্রে। গ্রামের সমস্ত সদস্য এক আমসভায় জমায়েত হয়ে তাদের গ্রামের ODF তকমা বজায় রাখার সংকল্প গ্রহণের পরই গ্রামগুলিকে উন্মুক্ত স্থানে শৌচকর্মের রেওয়াজবিহীন বলে ঘোষণা করা হচ্ছে। তারপর গ্রামবাসীদের মধ্যে থেকে কয়েক জনকে বেছে নিয়ে তৈরি করা হচ্ছে 'নিগরানি সমিতি', অর্থাৎ নজরদারি কমিটি; যাতে করে গ্রামের কেউই যেন শৌচালয় ছাড়া যত্রতত্র মলমূত্র ত্যাগ না করে তা নিশ্চিত করা যায়। এরপর ব্লক, জেলা বা রাজ্য স্তরের তৃতীয় পক্ষের দ্বারা সেই ODF তকমা যাচাই করে দেখা হয়। একেবারে গ্রামের প্রতিটি পরিবারতক এসংক্রান্ত যাবতীয় ডেটা বা তথ্য-পরিসংখ্যান এক বিপুল আয়তনের ডেটাবেস বা তথ্যভাণ্ডারে ধরে রাখা হয়েছে। স্বচ্ছ ভারত অভিযান (গ্রামীণ) ওয়েবসাইট থেকে সর্বসাধারণ সেই ডেটার নাগাল পেতে পারে।

স্বচ্ছ ভারত অভিযান (গ্রামীণ) কর্মসূচির আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ হল কঠিন ও তরল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বা Solid and Liquid Waste Management (SLRM)। বর্জ্য ব্যবস্থাপনার এই উদ্যোগকে ব্যয়সাশ্রয়ী ও দক্ষভাবে বাস্তবায়নের জন্য একেবারে তৃণমূল স্তরে মালিকানা তথা প্রতিটি পর্যায়ে জনগোষ্ঠীর যোগদান জরুরি। এজন্য এক বিশেষ উদ্যোগ হাতে নেওয়া হয়েছে। গ্রামবাসীরা নিজেরাই যাতে তাদের গ্রামটি কতখানি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, তার মাপজোক করতে সক্ষম হন, সেজন্য বানানো হয়েছে গ্রাম স্বচ্ছতা সূচক (Village Swachhata Index বা VSI)। গ্রামে বসবাসকারী কত শতাংশ পরিবার সঠিক মানের শৌচালয় ব্যবহারের সুযোগ পাচ্ছে এবং বাস্তবে ব্যবহার করছে, মানুষজনের বাড়িঘরের আশেপাশে ও মাঠঘাটের মতো প্রকাশ্য স্থানে ময়লা আবর্জনা স্তূপ হয়ে থাকছে কিনা, বাড়ির চারপাশে কোথাও জল জমে থাকছে কিনা ইত্যাদির বিচারে পরিচ্ছন্নতার মাপকাঠি অনুযায়ী গ্রামগুলির 'গ্রাম স্বচ্ছতা সূচক' নির্ধারণ করা হচ্ছে। গ্রামসভায় গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় গ্রামবাসীরা নিজেরাই এই মূল্যায়নের কাজটা করছেন। চলতি বছরের এপ্রিল মাস পর্যন্ত ৪ লক্ষেরও বেশি গ্রাম তাদের VSI পেশ করেছে।

একটা জিনিস বারংবার নজরে এসেছে, যখনই কোনও জনগোষ্ঠী স্যানিটেশন সংক্রান্ত কর্মযজ্ঞে হস্তক্ষেপের কাজে নিজস্ব মালিকানাধীন সম্পদ, বিশেষ করে আর্থিক সম্পদ বিনিয়োগ করেছে, দীর্ঘমেয়াদে ভালো ফল মিলেছে সেই সূত্রে। শৌচালয়ের প্রসঙ্গটিই টানা যাক। স্বচ্ছ ভারত মিশন শুধুমাত্র শৌচালয় নির্মাণের গণ্ডি ছাড়িয়ে মানুষের অভ্যাস তথা মানসিকতা পরিবর্তনের ভিত গড়ে দিচ্ছে। এই পরিবর্তন যে কতটা জরুরি, প্রধানমন্ত্রী বার বার সেই প্রসঙ্গ টেনে এনেছেন, স্বচ্ছ ভারত মিশন (গ্রামীণ) সংক্রান্ত তার বিবিধ ভাষণে। ২০১৬ সালে এমনই এক ভাষণে প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন, "পরিচ্ছন্নতা এমন একটা জিনিস, বাজেট বরাদ্দের মাধ্যমে তা অর্জন করা সম্ভব নয়; মানুষের অভ্যাসে পরিবর্তনের দৌলতেই এই সমস্যার সমাধান সম্ভব। একে এক গণ-আন্দোলনের চেহারা দিতে হবে।" পরিচ্ছন্ন ভারত গড়ার স্বপ্ন সাকার করার প্রশ্নে মানুষের অভ্যাস ও মানসিকতার পরিবর্তন যেমন

এক আবশ্যিক শর্ত; আবার তেমনি তা আরেক অর্থে বৃহত্তম চ্যালেঞ্জও বটে। এত বিপুল সংখ্যক মানুষের মনের কুসংস্কারের নাগপাশ ছিন্ন করে তাদের মানসিকতায় বদল আনতে উদ্যোগী হওয়ার সময় এদেশে নানা ক্ষেত্রের সাপেক্ষে বৈচিত্র্য, জটিলতা এবং বিভিন্নতাকে অবশ্যই হিসাবের মধ্যে আনতে হবে। এই মিশনের আওতায় কর্মসূচি সংক্রান্ত বেশ কিছু উদ্ভাবক পন্থা কাজে লাগানো হয়েছে। দেখা গেছে তার মধ্যে দু'টি উপায় সবচেয়ে বেশি কাজে আসছে। একটি হল, 'pre-triggering', অর্থাৎ, প্রদীপ জ্বালানোর আগে সলতে পাকানোর কাজটা সম্পন্ন করা। মানুষের অভ্যাসগত পরিবর্তন সাধনের কর্মকাণ্ডে হাত দেওয়ার কাজে কতটা সাফল্য পাওয়া যাবে তা মূলত নির্ভর করছে, কতটা সুচারুভাবে সলতে পাকাবার কাজটা, অর্থাৎ মূল কাজে নামার আগে প্রস্তুতি পর্ব সম্পন্ন হয়েছে। উল্লিখিত প্রস্তুতি পর্বের মধ্যে আসছে সংশ্লিষ্ট গ্রাম ও তার বাসিন্দাদের সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ, এদের সঙ্গে যোগাযোগ করা, সরকারি আধিকারিক ও গ্রামগুলিকে মূল কর্মকাণ্ড, অর্থাৎ 'triggering' পর্বের জন্য প্রস্তুত করা ইত্যাদি। গ্রামে স্যানিটেশনের কর্মযজ্ঞে জনগোষ্ঠীগুলিকে যুক্ত করার যে রেওয়াজ চালু করা হয়েছে, তাতে করে এই 'triggering' পর্ব সমাজের সর্ব স্তরের জন্য প্রযোজ্য হচ্ছে। আমরা এক একটি জনগোষ্ঠীকে এক একটি ইউনিট বা একক হিসাবে ধরে এগোচ্ছি; যাতে করে এরা নিজেদের গ্রামকে পরিচ্ছন্ন রাখার গুরুত্ব সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে এবং সেকাজ সম্পন্ন করার দায়িত্ব নিতে পারে তথা তার জন্য দায়বদ্ধ থাকে। এপ্রসঙ্গে সবচেয়ে আগে উল্লেখ করতে হয় 'স্বচ্ছাগ্রহী'-দের নাম। বলা যেতে পারে স্বচ্ছ ভারত মিশনের রথের চাকা এই গোষ্ঠী স্তরের থেকে বেছে নেওয়া পদাতিক সেনাদল; যারা কিনা গ্রামের মানুষকে সজাগ করে তুলতে, তাদের এই কর্মযজ্ঞে শামিল হতে উৎসাহিত করতে বিরামহীনভাবে কাজ করে চলেছে। এক ODF জাতি বা রাষ্ট্র গড়ে তোলার লক্ষ্যপূরণে এরা অনুঘটকের কাজ করছে অনেকাংশে। প্রায়শই দেখা যাচ্ছে, পঞ্চায়েতিরাজ প্রতিষ্ঠান, সমবায়, মহিলা গোষ্ঠী, জনগোষ্ঠীভিত্তিক প্রতিষ্ঠান, স্ব-নির্ভর গোষ্ঠী ইত্যাদির সঙ্গে যুক্ত সদস্য অথবা গ্রামের আশা কর্মী, অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীর মতো, ইতোমধ্যেই জনগোষ্ঠীর সেবার নিয়োজিত নেতা গোছের মানুষজনই বেশি করে স্বচ্ছাগ্রহী হিসাবে নাম লেখাচ্ছেন। গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকাগুলিতে এরা আগে থেকেই বিভিন্ন ক্ষেত্রে উন্নয়নের কাজে যুক্ত রয়েছে; এদের মধ্যে কেউ কেউ তো আবার বিশেষ করে স্যানিটেশনের জন্যই বিনা পারিশ্রমিকে স্বেচ্ছায় পরিষেবা দিচ্ছেন। এযাবৎকালীন স্বচ্ছাগ্রহী হিসাবে নাম নথিভুক্ত করেছেন ৪ লক্ষ ৩০ হাজার মানুষ। মিশনের লক্ষ্য দেশের প্রত্যেক গ্রামে একজন করে স্বচ্ছাগ্রহী থাকবে। তার অর্থ দাঁড়াচ্ছে, ২০১৯-এর মার্চের মধ্যে অন্তত ৬ লক্ষ ৫০ হাজার স্বচ্ছাগ্রহীর এক বিপুলবাহিনীর বন্দোবস্ত। জন-আন্দোলনের আওয়াজটা উচ্চগ্রামে বেঁধে রাখতে সচেষ্ট মন্ত্রক চলতি বছরের এপ্রিল মাসে স্বচ্ছাগ্রহীদের উপর ফোকাস করে এক বিশাল মাপের অনুষ্ঠানের আয়োজন করে, যেমনটা এর আগে কখনও দেখা যায়নি। আজ থেকে এক শতকেরও বেশি আগে ১৯১৭ সালের ১০ এপ্রিল তারিখে জাতির জনক, মহাত্মা গান্ধী সূচনা করেন চম্পারণ সত্যাগ্রহের। বিহারের মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেন। যার মধ্যে ছিল প্রাথমিক শিক্ষা, বৃত্তি শিক্ষার বিকাশ, মহিলাদের স্বশক্তীকরণ এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা। চলতি বছরের ১০ এপ্রিল তারিখে পালিত হয়েছে চম্পারণ সত্যাগ্রহের শতবর্ষের সমাপ্তি অনুষ্ঠান। এই সমারোহ উদ্‌যাপন করা হয়েছে "সত্যাগ্রহ থেকে স্বচ্ছাগ্রহ" শীর্ষক প্রচারাভিযানের মধ্য দিয়ে। এই অনুষ্ঠানকে স্মরণীয় করে রাখতে বিহার সরকারের সহযোগিতায় কেন্দ্রীয় পানীয় জল ও স্বাস্থ্যবিধান মন্ত্রক গোটা দেশজুড়ে পরিচ্ছন্নতার বার্তা ছড়িয়ে দিতে ৩ থেকে ১০ এপ্রিল পর্যন্ত সাত দিনব্যাপী "সত্যাগ্রহ থেকে স্বচ্ছাগ্রহ" শীর্ষক প্রচারাভিযান চালায়। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ১০ হাজারেরও বেশি স্বচ্ছাগ্রহী বিহারে জমায়েত হয়। সেখানে তাদের সাথে যোগ দেয় স্থানীয়, অর্থাৎ বিহারের বাসিন্দা আরও ১০ হাজার স্বচ্ছাগ্রহী। এরা একযোগে সেরাজ্যের ৩৮-টি জেলাজুড়ে শৌচকর্মের বিষয়ে মানুষের অভ্যাস পরিবর্তনের কর্মকাণ্ডে শামিল হয়। এভাবে এই জন-আন্দোলনকে এক অন্য উচ্চতায় নিয়ে যায় তারা।

স্যানিটেশনের সাতকাহন বিষয়ে মানুষকে সজাগ করে তোলার কাজটা শুরু হয় প্রভূত উৎসাহ-উদ্দীপনা সহকারে। বিহারের গ্রামে গ্রামে দেশের অন্যান্য প্রান্তের স্বচ্ছাগ্রহীদের উপস্থিতি দর্শক-শ্রোতাদের স্যানিটেশনের বার্তা হৃদয়ঙ্গম করতে অনুঘটকের কাজ করে। বাইরের রাজ্য থেকে আগত স্বচ্ছাগ্রহীদের ক্ষেত্রে ভাষাগত বাধা সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়নি; কারণ স্থানীয় স্বচ্ছাগ্রহী, সরকারি আধিকারিক ও টেকনিক্যাল কর্মীবৃন্দ এই বাধা দূর করতে তাদের সহায় হয়। এই উদ্যোগ প্রভূত সুফলদায়ক বলে প্রতিপন্ন হয়েছে। আরও ভালো কাজ করে দেখাবার মানসিকতার সূত্রে এক ধরনের সদর্থক প্রতিযোগিতার বাতাবরণ সৃষ্টি হয়েছে তথা বিভিন্ন গোষ্ঠীর পরস্পরের মধ্যে অভিজ্ঞতা বিনিময় ও নতুন কিছু শেখার সুযোগও হয়েছে। প্রসঙ্গত, স্যানিটেশন কর্মযজ্ঞে সাফল্যের প্রশ্নে চারটি রাজ্য— বিহার, উত্তরপ্রদেশ, ওড়িশা এবং জম্মু ও কাশ্মীর চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। অথচ এই চার রাজ্যেই চলতি বছরের ১৩ মার্চ থেকে ১০ এপ্রিলের মধ্যে অতিরিক্ত মোট ৩০ লক্ষ ৯১ হাজার শৌচালয় নির্মাণ সম্ভব হয়েছে; যার মধ্যে ১৪ লক্ষ ৮২ হাজার আবার হয়েছে ৪ থেকে ১০ এপ্রিল তারিখের মধ্যেই। এই পুরো অভিজ্ঞতাটির মধ্যে দিয়ে একতার যে বোধ জাগরিত হয়েছে তাতে করে ভারতকে উন্মুক্ত স্থানে শৌচকর্মের রেওয়াজমুক্ত দেশ হিসাবে গড়ে তুলতে জনগোষ্ঠীর মধ্যেকার জোরালো অনুভূতি যেন আরও মজবুত হয়ে উঠেছে। এ ছিল এমন এক পদক্ষেপ, যা জন-আন্দোলনের প্রকৃত মেজাজটাকে প্রতিফলিত করে স্বচ্ছ ভারত মিশন (গ্রামীণ)-এর সারমর্মকে এক নয়া সংজ্ঞা দিয়েছে। সকলের জন্য উন্নত স্যানিটেশন ব্যবস্থার সুযোগের নিরিখে বাকি বিশ্বের সামনে এই মিশন এক উদাহরণ খাড়া করার চেষ্টায় নিয়োজিত। একই সাথে রাষ্ট্রসংঘের ষষ্ঠ দীর্ঘমেয়াদি বিকাশ লক্ষ্যমাত্রা বা "Sustainable Development Goal 6"-এর শর্ত 'মিশন মোড'-এ পূরণ করে জলের স্থায়ী ভিত্তিতে ব্যবস্থাপনা এবং সকলের জন্য স্যানিটেশনের সুযোগ সুনিশ্চিত করাও স্বচ্ছ ভারত মিশনের অন্যতম উদ্দেশ্য।❑

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

বর্তমান সরকারের বিদেশ নীতি : প্রতিশ্রুতি এবং উপলব্ধির চার বছর

ড. কিংশুক চট্টোপাধ্যায়

মনমোহন সিং সরকারের দ্বারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে পরমাণু চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পরে ভারতের বৈদেশিক নীতি কার্যত স্তব্ধ হয়ে পড়েছিল বলে অনেকেই মনে করে থাকেন। নরেন্দ্র মোদীর মতো বলিষ্ঠ নেতার আগমনে তাই এই দিশাহীনতা দূর হবে, এমন আশা অনেকের মনেই জেগেছিল। তাছাড়া প্রধানমন্ত্রীর গদিতে নরেন্দ্র মোদীর দক্ষিণপন্থী পূর্বসূরি অটল বিহারী বাজপেয়ীর দৃষ্টান্ত স্মরণে রেখে অনেকেই আশা করেছিলেন যে প্রতিরক্ষা এবং বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে তিনিও যুগপৎ বলিষ্ঠ এবং বিচক্ষণ সাব্যস্ত হবেন।

বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের চার বছর পূর্ণ হওয়ার অবকাশে সরকারের তরফে এবং আলোচক মহলে সরকারের প্রতিশ্রুতি, প্রাপ্তি এবং সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা জোর কদমে এগিয়ে চলেছে। স্বাভাবিকভাবেই সরকারের ঘনিষ্ঠ আলোচকেরা সরকারের সাফল্যের ওপরেই বেশি গুরুত্ব আরোপ করেছেন, পক্ষান্তরে সরকারের সমালোচকেরা সরকারের ব্যর্থতার দিকে বেশি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছেন। তাই বর্তমান এনডিএ সরকারের বৈদেশিক নীতি সম্বন্ধে দু'টি সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থান দেখা যাচ্ছে; কিছু বিশেষজ্ঞ মনে করছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আমলে ভারতবর্ষের বিদেশ নীতিতে একটি বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা হয়েছে; অন্যদিকে কিছু বিশেষজ্ঞ মনে করছেন যে গত চার বছরে উল্লেখযোগ্য সাফল্য বলতে বিশেষ কিছু চোখে পড়েনি। নিরপেক্ষভাবে দেখলে মানতেই হবে এর আগের যেকোনও সরকারের মতোই বর্তমান এনডিএ সরকারের বিদেশ নীতিতেও সাফল্য এবং ব্যর্থতা দুই-ই আছে, এবং বৈপ্লবিক পরিবর্তন বিশেষ কিছু না হওয়ার কারণ, ভারতের বৈদেশিক সম্পর্ক কোনও মন্ত্রীর একক ইচ্ছায় বদলানো প্রায় অসম্ভব।

প্রত্যাশার কারণ এবং কিছু প্রাপ্তি

২০১৪ সালে ভারতীয় জনতা পার্টি নির্বাচনে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাওয়ার পরে বিশেষজ্ঞ মহলে এই আশার সঞ্চার হয় যে তার আগের প্রায় দুই দশক ধরে কোয়ালিশন বা জোট সরকারের বিভিন্ন বাধ্যবাধকতা সামলে যে অতি অনাড়ম্বর বিদেশ নীতির ধারা চলে আসছিল তার থেকে এবার সরে আসা সম্ভব হবে। বস্তুত, এই সমালোচনার প্রধান কারণ ছিল, পূর্ববর্তী সরকারের এক প্রকার নীতি-পঙ্গুত্ব এবং দিশাহীনতা। মনমোহন সিং সরকারের দ্বারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে পরমাণু চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পরে ভারতের বৈদেশিক নীতি কার্যত স্তব্ধ হয়ে পড়েছিল বলে অনেকেই মনে করে থাকেন। নরেন্দ্র মোদীর মতো বলিষ্ঠ নেতার আগমনে তাই এই দিশাহীনতা দূর হবে, এমন আশা অনেকের মনেই জেগেছিল। তাছাড়া প্রধানমন্ত্রীর গদিতে নরেন্দ্র মোদীর দক্ষিণপন্থী পূর্বসূরি অটল বিহারী বাজপেয়ীর দৃষ্টান্ত স্মরণে রেখে অনেকেই আশা করেছিলেন যে প্রতিরক্ষা এবং বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে তিনিও যুগপৎ বলিষ্ঠ এবং বিচক্ষণ সাব্যস্ত হবেন।

মানতেই হবে যে ক্ষমতায় আসামাত্রই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী কতকটা ব্যতিক্রমী আচরণ করেছিলেন। তার শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে পাকিস্তান-সহ ভারতের প্রতিবেশী সব ক'টি দেশের রাষ্ট্রনায়কদের ডেকে ভারত এমন একটি ইতিবাচক ইঙ্গিত দিয়েছিল যা এযাবৎকালে দেখা যায়নি। বিশেষজ্ঞরা এটিকে "Neighbourhood First" নীতির সূচনা বলে ভাবতে শুরু করেন। এমনকি এক বিদেশ সফর থেকে ফেরার পথে প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত কর্মসূচির বাইরে গিয়ে

[লেখক কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক। ই-মেল : kchat18@gmail.com]

পাক প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফের পারিবারিক অনুষ্ঠানে সামিল হয়ে উপমহাদেশের কূটনৈতিক ইতিহাসে এক বিরল দৃষ্টান্তও স্থাপন করেন। এছাড়া বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতিকল্পে দীর্ঘ দিনের বকেয়া ছিটমহল সমস্যা পারস্পরিক জমি বিনিময়ের মাধ্যমে মেটাতে সফল হন; এমনকি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রবল আপত্তি না থাকলে হয়তো তিস্তা জল বণ্টন সমস্যাও মিটিয়ে ফেলতে পারতেন।

আরেকটি ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন ভারত সরকার প্রকৃত অর্থেই ব্যতিক্রমী সাব্যস্ত। ভারত সরকার আজ বিদেশে বসবাসকারী ভারতীয় বা ভারতীয় বংশোদ্ভূত নাগরিকদের অধিকার রক্ষায় অনেক বেশি সচেষ্ট এবং সফল। নব্বইয়ের দশকের গোড়ায় উপসাগরীয় যুদ্ধের সময় কুয়েতে আটকে থাকা ভারতীয় নাগরিকদের নিরাপদে দেশে ফেরার ব্যবস্থা না করেই কুয়েতের ভারতীয় দূতাবাস ঝাঁপ ফেলে দিয়েছিল। আজ পরিস্থিতি অনেকটাই আলাদা। ২০১৪ সালে ইরাকে কর্মরত ৪৬জন ভারতীয় নার্স মসুল-এ ইসলামিক স্টেট জঙ্গিদের হাতে বন্দি হওয়ার পরে ভারতীয় বিদেশ মন্ত্রক তাদের ছাড়িয়ে আনতে সফল হয়েছে। ২০১১ সালে মিশরে গণ-আন্দোলনের থেকে শিক্ষা নিয়ে আজ ভারতীয় দূতাবাস মিশরে কর্মরত প্রায় সাড়ে তিন হাজার ভারতীয় নাগরিকের মধ্যে প্রত্যেকটি লোকের সঙ্গে সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে প্রতিনিয়ত যোগাযোগ রেখে চলেছে, যাতে সামান্য কোনও বিপদের সম্ভাবনা দেখা দিলেই তারা ভারতীয় নাগরিকদের নিরাপদে সরিয়ে আনতে পারে। এমন একাধিক ঘটনাও ঘটেছে যখন বিপন্ন কোনও ব্যক্তি সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে বিদেশমন্ত্রী শ্রীমতী সুষমা স্বরাজের দ্বারস্থ হওয়াতে অনতিবিলম্বেই সেই সমস্যা দূর করা হয়েছে।

বিদেশে বসবাসকারী ভারতীয় বা ভারতীয় বংশোদ্ভূত নাগরিকদের বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী স্বয়ং বিশেষভাবে উদ্যোগী হয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী হবার পরে নরেন্দ্র মোদী তার বিদেশযাত্রার সময় সবথেকে বেশি অগ্রাধিকার দিয়েছেন সেই সব দেশগুলিকে,

যেখানে প্রবাসী ভারতীয় বা ভারতীয় নাগরিকরা পরিযায়ী শ্রমিক হিসাবে কর্মরত রয়েছেন। তাই বিশাল প্রবাসী ভারতীয় জনসংখ্যা সম্বলিত ব্রিটেন বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তো বটেই, বৃহত্তম পরিযায়ী জনসংখ্যা সম্বলিত পারস্য উপসাগরীয় রাজ্যগুলিতেও (সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরশাহি, কাতার) প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং বিদেশযাত্রায় গেছেন, এবং সেখানে প্রবাসী ভারতীয় বা ভারতীয় নাগরিকদের সঙ্গে আলাদাভাবে মিলিত হয়েছেন। নিউ ইয়র্কের টাইমস স্কোয়ার বা লন্ডনের ওয়েম্বলি স্টেডিয়াম—প্রবাসী মহলে সর্বত্রই তাই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিশাল জনপ্রিয়তা লক্ষ্য করা যায়।

বৈদেশিক সম্পর্কের হাল-হকিকৎ

বর্তমান এনডিএ সরকার যে বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে বিশেষভাবে সক্রিয়, তা অস্বীকার করলে সত্যের অপলাপ হবে। গত চার বছরে বিশ্বের ১৯২-টি দেশের মধ্যে ১৮৫-টি দেশেই ভারত সরকারের প্রতিনিধি দল পাঠানো হয়েছে। ২০১৮ সালের মে মাস অবধি প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং ৩৬-টি বিদেশ সফরে ৫৪-টি দেশে গিয়েছেন। বিশ্বের বহু নেতার সঙ্গেই তার ব্যক্তিগত সখ্যতার সম্পর্ক না হলেও সৌহার্দ্যের সম্পর্ক নিঃসন্দেহে রয়েছে। যেমন, জাপানের প্রধানমন্ত্রী শিঞ্জো আবে, ইজরায়েলের বেঞ্জামিন নেতাইনয়াহু, ইত্যাদি। এছাড়াও, বিশ্বের মঞ্চে নরেন্দ্র মোদী সরকারের আচরণ তার পূর্বসূরিদের গরিমা থেকে সামান্যতম বিচ্যুতি ঘটিয়েছেন এমনটা মনে করার কোনও কারণ নেই। শিল্প-বান্ধব এবং দক্ষিণপন্থী মতাবলম্বী হবার ফলে জলবায়ু পরিবর্তনের তত্ত্ব অস্বীকার করতে পারেন এমন আশঙ্কার অবসান ঘটিয়ে জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত চুক্তিগুলি মেনে চলার অঙ্গীকার করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সরকার আমেরিকার ট্রাম্প সরকারের মতো দায়িত্বজ্ঞানহীন আচরণ করা থেকেও বিরত থেকেছে।

শীত-যুদ্ধোত্তর আমলে ভারতবর্ষের সঙ্গে পাশ্চাত্য দুনিয়ার সম্পর্কের যে নিরবচ্ছিন্ন উন্নতি হয়ে চলেছিল, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আমলেও তা অব্যাহত থেকেছে। রাষ্ট্রপতি ওবামার আমলে ভারত, এশিয়ার মধ্যে মার্কিন ভূ-রাজনৈতিক পরিকল্পনার এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে উঠেছিল, যার সূত্র ধরে প্রধানমন্ত্রী মোদী মার্কিন প্রতিরক্ষা সংস্থার জন্য ভারতীয় প্রতিরক্ষা বাজারের দরজা খুলে দিতে সচেষ্ট হয়েছেন। বর্তমান রাষ্ট্রপতি ট্রাম্প তাতে বাধ না সাধলে অনতিবিলম্বেই ভারত-মার্কিন প্রতিরক্ষা সম্পর্ক আরও গভীর হতে থাকবে। আগের সরকারের আমল থেকে চলতে থাকা

ফ্রান্সের সঙ্গে প্রতিরক্ষা সম্পর্কও নরেন্দ্র মোদীর আমলে ২০১৫ সালে রাফায়েল চুক্তি এবং পারমাণবিক সম্পর্ক স্থাপনের অঙ্গীকারের মাধ্যমে পূর্ণতা পেয়েছে।

নরেন্দ্র মোদী সরকারের কিছু সমালোচক মনে করেন যে, পশ্চিমের সঙ্গে ভারতের এই ক্রমশ বাড়তে থাকা সান্নিধ্য ভারতের চিরাচরিত জোট-নিরপেক্ষ অবস্থানে বিচ্যুতি আনছে। সেই আশঙ্কা কতকটা অমূলক। ভারতের মার্কিন-ঘনিষ্ঠতা সত্ত্বেও নরেন্দ্র মোদীর আমলেও প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে ভারতের বৃহত্তম বিদেশি অস্ত্র সম্ভার এবং অস্ত্র প্রযুক্তির উৎস হল রাশিয়া। পরমাণু ক্ষেত্রেই হোক বা ডুবোজাহাজই হোক, আজও মস্কোই প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে ভারতের সবথেকে বড়ো সহায়। এছাড়াও সিরিয়ার মতো একাধিক ক্ষেত্রে নতুন দিল্লির ভূ-রাজনৈতিক সান্নিধ্য আমেরিকার তুলনায় রাশিয়ার সঙ্গে অনেক বেশি।

যেখানে বর্তমান সরকারের আমলে প্রকৃত অর্থে কিছু পরিবর্তন চোখে পড়া সম্ভব তা হল, ভারতের এশিয়া নীতি—পশ্চিম এবং পূর্ব এশিয়া, উভয় ক্ষেত্রেই। এ যাবৎকালে সম্ভবত সবথেকে বেশি আলোচিত হয়েছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর পশ্চিম এশিয়া নীতি, বিশেষত ইজরায়েলের সঙ্গে সান্নিধ্য। নরেন্দ্র মোদীই প্রথম ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী যিনি ইজরায়েল সফরে গিয়ে প্যালেস্তাইন-এ যাননি। অবশ্য এর কিছুদিন পরে আলাদা করে প্যালেস্তাইন সফরেও যান তিনি। প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে ইজরায়েল খুব অল্প সময়ের মধ্যেই ভারতের প্রতিরক্ষা খাতে আমদানির অন্যতম উৎস হিসাবে প্রতিভাত হয়েছে, এবং অচিরেই এই সম্পর্ক আরও উন্নত হবে এমন সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে উঠছে। আরও একটি বড়ো পরিবর্তন হল, আরব উপদ্বীপের রাজ্যগুলির সঙ্গে ভারতের ক্রমশ বাড়তে থাকা ঘনিষ্ঠতা। প্রধানত সৌদি আরব, আরব আমিরশাহী এবং কাতারের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্যিক সম্পর্ক এখন শুধু ভারতের তেল এবং তৈলজাত পণ্য আমদানিতেই সীমাবদ্ধ নয়, ভারতের রপ্তানির পরিমাণও ক্রমশ বেড়ে চলেছে। তদুপরি, পরিষেবা রপ্তানির ক্ষেত্রেও উপদ্বীপের অর্থনীতিতে ভারতের ভূমিকা ক্রমশ বাড়ছে। কার্যত এরই স্বীকৃতি স্বরূপ সৌদি আরবের রাজা সলমান ইয়েমেনের

বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরুর প্রাক্কালে যে সমস্ত দেশগুলিকে পাশে চেয়েছিলেন, তার মধ্যে ভারত ছিল অন্যতম।

সম্ভবত বর্তমান সরকারের আমলে বলিষ্ঠতম নীতি বিষয়ক পদক্ষেপ হল পূর্ব এশিয়ার পরিপ্রেক্ষিতে। ১৯৯০-এর দশকেই ভারতের বিদেশ নীতির একটি অভিমুখ পূর্ব এশিয়ার দিকে করা হয়েছিল, যা মূলত অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানেই সীমাবদ্ধ ছিল; একে বলা হ'ত Look East Policy। নরেন্দ্র মোদীর আমলে এটিকে আরেক ধাপ এগিয়ে নিয়ে একটি ভূ-রাজনৈতিক মাত্রা যোগ করা হয়; যাকে বলা হয় Act East Policy। এর সূত্র ধরে ভারত-ভিয়েতনাম সম্পর্ক আরও গভীর হতে চলেছে, এবং দক্ষিণ-চীন সাগরের মতো সমস্যা, যাতে ভারত এর আগে কখনই অবস্থান নিয়ে উঠতে পারেনি, তাতেও তার অবস্থান স্পষ্ট করে দিয়েছে। এই নীতির ফলে ভারতের পূর্ব এশিয়ায় উপস্থিতি আরও বাড়ছে এবং ভিয়েতনামের মতো অন্যান্য যেসব দেশ তাদের এলাকায় চিনের ছায়া দীর্ঘতর করতে নারাজ, ভারত তাদের সহায় সাব্যস্ত হবে। একই কারণে জাপানের সঙ্গে ভারতের সম্পর্কও তাল মিলিয়ে আরও উন্নত হবার সম্ভাবনা রয়েছে।

বিপ্লব, ব্যর্থতা, না ভারসাম্য?

বিদেশ নীতির বিশেষজ্ঞরা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সরকারের বিদেশ নীতির বিশ্লেষণ করতে গিয়ে দেখা যাচ্ছে কতকটা ধন্দে পড়েছেন। সি. রাজামোহনের মতো লোকেরা মনে করেন বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর আমলে ভারতের বিদেশ নীতিতে প্রকৃতই এক বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা হয়েছে। রাজামোহন মনে করেন, বাজপেয়ীর আমলে ভারতবর্ষের বিদেশ নীতি প্রকৃত অর্থে প্রাপ্তবয়স্ক হতে শুরু করে, এবং তার দক্ষিণ এশীয় বাক্সের বাইরে বোরোতে শুরু করেছিল। নরেন্দ্র মোদীর আমলে এই বিবর্তন স্বাভাবিক পরিণতি পেতে শুরু করেছে এক বলিষ্ঠ, শক্তিশালী বিদেশ নীতির মাধ্যমে। তাই সচরাচর ভারতীয় কূটনীতিতে যে সতর্কতার ছাপ দেখা যেত (যেমন, ১৯৯৯ সালে কার্গিলের সময়), ভারত সেই সীমাবদ্ধতা আজ কাটিয়ে উঠেছে। এই পেশিশক্তি প্রদর্শনমূলক বিদেশ নীতি (muscular foreign policy)-এর আগে দেখা গিয়েছিল যখন ২০১৫ সালে মায়ানমারের সীমান্ত অতিক্রম করে কম্যান্ডো অপারেশন চালানো হয়েছিল (বা ২০১৭ সালে পাকিস্তানে)। এতে ভারতের শত্রুরা বুঝতে পেরেছে (বলে আশা করা যায়) যে ভারতের দিকে ওঠা প্রতিটি হাত ওই ভাবেই নামিয়ে দেওয়া হবে।

অন্যদিকে কেউ কেউ মনে করেন যে, এই ধরনের বিদেশ নীতির জন্য যতটা পেশির প্রয়োজন রয়েছে, ভারতের ঠিক ততটা পেশি গড়ে ওঠেনি। তাই, ২০১৭ সালেই ভুটানের ডোকলাম নিয়ে চিনের সঙ্গে যে সীমান্ত সংঘর্ষের সূচনা হয়েছিল, তাতে ওই পেশি শক্তি প্রদর্শনমূলক বিদেশ নীতি প্রায় যুদ্ধ বাধাবার উপক্রম করে ফেলেছিল। কূটনৈতিক দক্ষতায় ভারতের বিদেশ মন্ত্রক ওই সংকট কাটাতে সফল হলেও অশনি সংকেত দেখা দিয়েছিল বৈকি। অর্থাৎ, দুর্বল প্রতিপক্ষের সামনে টিকে গেলেও বৈপ্লবিক পরিবর্তনের যে ধারণা সরকার প্রতিষ্ঠা করেছিল তা বেশি দিন ধোপে টেঁকেনি।

সুমিত গাঙ্গুলীর মতো বিশেষজ্ঞেরা মনে করেন যে বর্তমান সরকার ভারতের বিদেশ

নীতিতে প্রকৃত অর্থেই কিছু যুগান্তকারী পরিবর্তনের চেষ্টা করেছিল, কিন্তু ভারতের বিদেশ মন্ত্রকের আমলাদের রক্ষণশীলতার কাছে সরকার পরাস্ত হয়েছে। এদের বিশ্বাস সরকারের রাজনৈতিক সদিচ্ছা ছিল ভারতীয় বিদেশ নীতিতে এক আমূল পরিবর্তন আনার—বিশেষত চিন এবং পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্কে আরও বলিষ্ঠ এবং দৃঢ় নীতি প্রণয়নের। তাই প্রথম দিকে ইসলামাবাদের দিকে সৌহার্দ্যের হাত বাড়ালেও কাশ্মীর প্রসঙ্গে আলোচনার প্রাক্কালে পাক দূতাবাসে কাশ্মীরী বিচ্ছিন্নতাবাদীদের অনুপস্থিতির কারণে আলোচনা পুরোপুরি মুলতুবি করে দিতেও সরকার দ্বিধা করেনি। কিন্তু তাতে কাশ্মীর সমস্যার কোনও সমাধান তো দেখাই যায়নি, বরং অনুরূপ দৃঢ় নীতি ডোকলাম-এ নেবার জন্য যে সমস্যা হয়, তা পেশাদারী কূটনীতিবিদেরাই সামলে দেয়। নেপালের সংবিধানকে কেন্দ্র করে কাঠমান্ডুর সঙ্গে যে মনোমালিন্য হয়, তার ফলে ভারতের প্রচ্ছন্ন মদতে নেপাল সীমান্ত অবরোধ করার পরে নেপালও ক্রমশ চিনের বৃত্তে প্রবেশ করতে শুরু করে। এর পরে পেশি শক্তি প্রদর্শনমূলক বৈদেশিক নীতির দিকে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের গতি কিছুটা শ্লথ হয়ে পড়েছে।

এতে বিশেষ সন্দেহের অবকাশ নেই যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সরকার বাস্তবিকই আমূল পরিবর্তন আনতে চেয়েছিল ভারতের বিদেশ নীতিতে। চিন এবং পাকিস্তান নীতির মতোই ভারতের ইজরায়েল নীতিতেও সরকার পরিবর্তন ঘটাতে বদ্ধপরিকর ছিল বলে বোঝা যায়। বলা হয় বিদেশ মন্ত্রকের চাপেই ভারতের চিরাচরিত আরব-ঘনিষ্ঠ নীতি ত্যাগ করতে পারেনি সরকার।

বাইরে থেকে বর্তমান সরকারের বিদেশ নীতিতে এক টানাপোড়েন চলছে বলে মনে করা হয়; কিন্তু তা এই প্রথমবারই হচ্ছে এটা মনে করার কোনও কারণ নেই। এমনটা আগের সব সরকারের আমলেও হয়েছে। হওয়াটাই স্বাভাবিক। এই টানাপোড়েনেই সৃষ্টি হয় বিদেশ নীতির ভারসাম্য। এই কারণেই ভারত সরকার একই সময় মার্কিন সরকারের ঘনিষ্ঠ হয়ে এশিয়ায় চিনের ক্ষমতা সংকোচনের চেষ্টাও করতে পারে, আবার মার্কিন নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে চিনের মতোই ইরানের থেকে তেল আমদানিও করতে পারে জাতীয় স্বার্থের কথা ভেবে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যেমন, ইজরায়েল সফরের ঠিক আগেই প্যালেস্টাইন-এর কর্ণধার মাহমুদ আব্বাসকে ভারত সফরে আসতে বলেন। ঠিক একইভাবে ডোকলাম-এ অনমনীয়তার জন্য ভারত কোণঠাসা হলেও বিদেশ মন্ত্রক চিনের One Belt One Road-নীতির দৃঢ়ভাবে বিরোধিতা করে প্রধানমন্ত্রীর হাত শক্ত করে চলেছে, কারণ তা ভারতের জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী।

উপসংহার

পরিশেষে বলা প্রয়োজন যে, যেকোনও দেশের বিদেশ নীতি খুব অল্প ক্ষেত্রেই কোনও একজন বা কয়েকজন লোকের বৈদেশিক নীতি সংক্রান্ত চিন্তার ফল সাব্যস্ত হয়। তেমনই খুব অল্প ক্ষেত্রেই একটি দেশের বিদেশ নীতি কোনও একটি গোষ্ঠীর বা একটি দলের মতাদর্শের দ্বারা নির্ধারিত হতে পারে। একটি দেশের বৈদেশিক নীতি সাধারণত সেদেশের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, কূটনৈতিক স্বার্থসমূহের দ্বারা নির্ধারিত হয়ে থাকে, যদিও সেই স্বার্থ-সমষ্টির প্রকাশ এবং অভিব্যক্তি কোনও নির্দিষ্ট সময় ঠিক কেমন হবে, তা নির্ভর করে সেই সময় যারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছে তাদের ওপর। নরেন্দ্র মোদী সরকারের চার বছরে ভারতের জাতীয় স্বার্থের সংজ্ঞা তার আগের সময়কালের থেকে খুব বেশি বদলায়নি, তাই বলা চলে বিদেশ নীতিতে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটও তৈরি হয়নি। ফলে পরিবর্তনের ইচ্ছা এবং সহজাত কূটনৈতিক রক্ষণশীলতার মধ্যে যে টানাপোড়েন চলতে থাকে, গত চার বছরের বৈদেশিক নীতিতে আমরা তারই পরিচয় পেয়েছি। ভবিষ্যতে দেশের স্বার্থ-সমষ্টিতে গুণগত পরিবর্তন এলে তবেই বৃহত্তর পরিবর্তনের প্রেক্ষাপট রচিত হওয়া সম্ভব হবে। ❑

GET YOUR CAREER SECURED WITH TOP GOVERNMENT JOBS

IAS / IPS

Best Faculties From Delhi & Allahabad

Attend our Free seminar & Know How to become a Civil Servant?
& avail special Discount through Scholarship Test.

Optional Subjects Available:

Geography / History / Sociology / Anthropology.

Our Faculties

History:	**Parampreet Sir**
Polity:	**Tanvi Mam**
Geog:	**D.Chandra Sir**
Eco:	**S.K Jha Sir**
Current:	**C. Shekhar Sir**

IAS / WBCS
Separately
Test Series
20 Test for Prelims
20 Test for Mains

WBCS

Special Batch for WBCS Mains

History	:	Amit Sen Sir
Polity	:	Nandan Dutta Sir
Geog	:	Moumita Mam
Eco	:	Joytirmoy Nag Sir
Current	:	Sourajit Sir
English	:	Kumar Gaurav Sir
G.A	:	Vijay Ram Sir
Reasoning	:	Bijoy Sir & Kamlesh Sir
Maths	:	Sanjeev Sir

- ✓ General and Separate batches for various competitive examinations.
- ✓ Batches completed on time.
- ✓ Doubt clearing sessions by individuals.
- ✓ Best study material and printed assignment on important topics.
- ✓ Regular seminar and motivational session with field experts and selected candidates.
- ✓ Provision for clean, cool drinking water and AC classrooms.
- ✓ Use of online and offline Mock Tests
- ✓ Library facilities for studies.

THE INSTITUTE For Competitive Studies TICS

TICS

Where selection is passion
(A Unit Of TICS EDUWORLD LLP)

Call: 8478053333 / 03340644654

Email: info@ticsias.com Web: www.ticsias.com

HO.TICS: 90/6-A, M.G. Road YMCA Building 2nd Floor Near College Street Kol-07

Subscription Coupon

[For New Membership / Renewal / Change in Address]

I want to subscribe to _____ (Journal's name & language)

☐ 1. yr. for Rs. 230/- ☐ 2. yrs. for Rs. 430/- ☐ 3. yrs. for Rs. 610/-

DD/MO No. _____ Date _____

Name (in block letters) _____

Category Student / Academician / Institution / Others

Address _____

_____

PIN ☐☐☐☐☐☐

Phone _____

P.S. : For Renewal / change in address — please quote your subscription No. ☐

Please allow 8 to 10 weeks for the despatch of 1st issue.

The DD/MO should be drawn in favour of :

The Editor

Dhanadhanye (Yojana-Bengali)

Publications Division

8, Esplanade East, Kolkata-700 069

ATTENTION PLEASE

YOU CAN ALSO SEND YOUR SUBSCRIPTION THROUGH BHARATKOSH (NON-TAX RECEIPT PORTAL)

ভারতে কর সংস্কার : সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

টি. এন. অশোক

বেশিরভাগ কর বিশেষজ্ঞই অবশ্য মনে করেন পণ্য পরিষেবা কর বা GST এবং প্রত্যক্ষ কর বিধি বা DTC চালু হওয়া সরকারের তরফে এখনও পর্যন্ত সবচেয়ে বড়ো কর সংস্কার। এর ফলে কর প্রদানে গতি আসবে। সুবিধা হবে দেশ-বিদেশের লগ্নিকারীদের। DTC এবং GST, কর ব্যবস্থার সরলীকরণ, করদাতার সংখ্যা বৃদ্ধি, এবং মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের নিরিখে কর রাজস্বের অনুপাত বাড়াতে (Tax Buoyancy) সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলবে বলে তাদের আশা। এর ফলে দেশের আর্থিক ঘাটতিও কমবে। সরল কর ব্যবস্থা এদেশকে বিনিয়োগের অন্যতম আকর্ষণ কেন্দ্র করে তুলবে বলেও বিশেষজ্ঞরা মনে করেন।

অর্থনৈতিক দিক থেকে এগিয়ে চলা যেকোনও দেশেই বিপুল পরিমাণে অভ্যন্তরীণ এবং বৈদেশিক বিনিয়োগ জরুরি। কিন্তু কর ব্যবস্থা যুক্তিসংগত, দুর্নীতিমুক্ত, নিরপেক্ষ এবং বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করার মতো না হলে লগ্নি আসা কঠিন।

সারা বিশ্বের ক্ষেত্রেই একথা খাটে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া-সহ বেশিরভাগ উন্নত দেশেই চালু হয়েছে প্রগতিশীল কর ব্যবস্থা (Progressive Taxation System)। ভারতও তার ব্যতিক্রম নয়। বিভিন্ন সরকারের আমলে ধারাবাহিকভাবে করদাতার সংখ্যা বাড়ানো এবং কর কাঠামো আরও ধোঁয়াশামুক্ত ও যুক্তিসংগত করার লক্ষ্যে সংস্কারের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে।

ভারতীয় কর ব্যবস্থার ওপর গবেষণায় একটা বিষয় খুব স্পষ্টভাবে উঠে এসেছে। তা হল, অতীতে কোনও এক সময়ে সংকীর্ণ ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে থাকা (করদাতার স্বল্প সংখ্যা), জটিল এবং দমনমূলক চেহারা ঝেড়ে ফেলে এদেশের কর ব্যবস্থা এখন অনেক স্বচ্ছ বা ধোঁয়াশামুক্ত ও সুদক্ষ। বিগত বছরগুলিতে কর সংস্কারের ক্ষেত্রে রাজস্ব আদায় বৃদ্ধির পাশাপাশি জোর দেওয়া হয়েছে কর ফাঁকি রোধ করার ওপর। কর সংস্কারের প্রথম পর্বে যেসব উদ্যোগ হাতে নেওয়া হয়েছিল, তার মধ্যে অন্যতম হল রাজ্য স্তরের বিক্রয় করকে মূল্যযুক্ত কর বা VAT-এ রূপান্তরিত করা। এতে করে প্রশাসনের উপর অত্যন্ত সদর্থক প্রভাব পড়ে। এই নিবন্ধে আলোচনা মূলত এগিয়েছে বিশিষ্ট বিশেষজ্ঞ গোবিন্দ মারাপাল্লি রাও-এর গবেষণার মধ্যে দিয়ে উঠে আসা কিছু তথ্যের উপর ভিত্তি করে। তিনি বর্তমানে National Institute for Public Finance and Policy-র এমারিটাস প্রফেসর। Public Finance, Public Economics, Microeconomics-এর মতো অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রচুর গবেষণামূলক কাজকর্ম করেছেন তিনি।

কর সংস্কারের ক্ষেত্রে অনেক দূর এগোনো গেছে, এমনটাই মনে করেন বিশেষজ্ঞরা। কর ব্যবস্থার আওতায় আরও অনেক বেশি মানুষকে নিয়ে আসা এবং গোটা কর প্রশাসন ব্যবস্থাকে অধিকতর কর্মদক্ষ করে তোলার জন্য অনেক কাজ এখনও বাকি হয়ে গেছে। কর্পোরেট কর বা বাণিজ্য সংস্থাগুলির কর, অন্তঃশুল্ক, বহিঃশুল্ক, বিক্রয় কর, ডিজেল ও পেট্রোলের ওপর ধার্য কর আদায়ের ক্ষেত্রে কর্মদক্ষতা আরও বাড়ানো জরুরি। দেশে ব্যক্তিগত আয়কর দাতার সংখ্যা এখনও বেশ কম। বিক্রয় কর সংস্কারের কাজ সবেমাত্র শুরু হয়েছে। এক্ষেত্রে খুচরো ব্যবসার ক্ষেত্রে গন্তব্য ভিত্তিক মূল্যযুক্ত (VAT) ব্যবস্থার সংস্কারে আরও বেশ কয়েক ধাপ এগোতে হবে।

কর প্রশাসনে সংস্কারের দৌলতে রাজস্ব আদায় বাড়বে এবং তার ফলে ভবিষ্যতে আরও বেশি করে সংস্কারের পথে এগোনো

[লেখক বিশিষ্ট অর্থনীতি বিষয়ক সাংবাদিক। সংবাদ সংস্থা PTI-এর প্রাক্তন Editor and Chief of Bureau। কাজ করেছেন ফরাসি প্রযুক্তি সংস্থা ALSTOM এবং সুইডেন ও সুইজারল্যান্ডের সংস্থা ABB-র বার্তা বিশেষজ্ঞ হিসেবে। ই-মেল : feedback@ashoktnex@gmail.com]

সম্ভব হবে, এমনটা আশা করাই যায়। গত শতকের নব্বই-এর দশকের শুরুর দিকে বিনিয়োগ টানতে বিপুল অর্থনৈতিক সংস্কারযজ্ঞের সময়ে বেশ কিছু প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল এক্ষেত্রে।

নব্বইয়ের অর্থনৈতিক সংস্কারের সময় থেকে করারোপ নীতি

কেন্দ্রীয় সরকারের ১৯৯১ সালের আগের কর কাঠামোর সঙ্গে এখনকার তুলনা করলে এটা স্পষ্ট হয় যে আন্তর্জাতিক প্রবণতার সঙ্গে তাল মিলিয়ে ভারত সরকার আয়কর, অন্তঃশুল্ক এবং বাণিজ্য করের হার হ্রাসের পথে হাঁটছে। এরই সঙ্গে রাজ্যগুলিও তাদের বিক্রয় করের হারে সমন্বয়ের পথে এগিয়েছে। এক্ষেত্রে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ হল ২০০৫ সালের পয়লা এপ্রিল মূল্যযুক্ত কর বা VAT প্রবর্তন। ১৯৫০ সালে ভারতীয় সাধারণতন্ত্রের আত্মপ্রকাশের পর কেন্দ্রীয় স্তরের বাইরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কর সংস্কার এটি।

১৯৯১ সালের আগে ভারতের সার্বিক কর কাঠামো যে বেশ ত্রুটিপূর্ণ ছিল তা বলাই বাহুল্য। আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটের বিচারে আয়করের হার ছিল অত্যধিক। গত শতকের আশির দশকের মাঝামাঝি থেকে কয়েকটি নির্বাচিত ক্ষেত্রে লাগু হওয়া ছাড়া মূল্যযুক্ত কর বা VAT-এর কোনও সংস্থানই ছিল না। ভোগ কর (Consumption Tax) দাতার সংখ্যা ছিল নগণ্য। পরিষেবা করের অস্তিত্ব ছিলই না। বহিঃশুল্কের হার ছিল বেশ চড়া। এক্ষেত্রে ছাড়ের বিষয়টিও ছিল অত্যন্ত জটিল। কয়েকটি নির্বাচিত ক্ষেত্রে যেভাবে রপ্তানি শুল্ক বলবৎ ছিল, তা আন্তর্জাতিক বাজারে দেশের চিরাচরিত রপ্তানি পণ্যগুলিকে প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে অসুবিধায় ফেলছিল। রাজ্যগুলির বিক্রয় কর ব্যবস্থাও ছিল অত্যন্ত অবৈজ্ঞানিক। কাঁচামালের ওপর লাগু কর উপর্যুপরি পদ্ধতিতে জমা হতে হতে বাজারে জিনিসপত্রের দাম অহেতুক বাড়িয়ে দিত। করের ওপরেই আবার কর বসতে থাকায় এমনটা হওয়া অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়েছিল। ফলে, সংস্কারের পথে এগিয়ে কর কাঠামোয় যুক্তি ও সমতাবিধানের প্রশ্নে বিশেষজ্ঞরা প্রায় সকলেই একমত হয়ে ওঠেন।

সারণি-১
দেশি ও বিদেশি কোম্পানিগুলির ক্ষেত্রে কর্পোরেট কর হ্রাস

	১৯৯০-'৯১	১৯৯২-'৯৩	১৯৯৫-'৯৬	১৯৯৭-'৯৮	২০০১-'০২	২০০৪-'০৫
দেশি সংস্থা	৫০	৪৫	৪০	৩৫	৩৫	৩৫
বিদেশি সংস্থা	৬৫	৬৫	৫৫	৪৮	৪৫	৪০

সূত্র : অর্থমন্ত্রক, ভারত সরকার

কর কাঠামোর পুনর্বিন্যাসে অনেক সমস্যাও পোহাতে হয়েছে সরকারকে। করদাতার সংখ্যা ছিল কম। ফলে করের হার কমানোর ফলে রাজস্ব ক্ষতি মেটানো সরকারের পক্ষে সম্ভব হচ্ছিল না। ১৯৯৪ সালের পর কেন্দ্রীয় সরকারের কর রাজস্ব আদায় মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের বিচারে ১ শতাংশ কমে যায়। আমদানি বা অন্তঃশুল্ক বাবদ রাজস্ব আদায়ের হ্রাস আয়কর বাবদ রাজস্ব বৃদ্ধির মাধ্যমে মেটানো সম্ভব হয়নি। তার ওপর অনেক ক্ষেত্রে শেষবারের মতো কর ছাড়ের সুবিধা দেওয়া হয়েছিল। আবার অনেক ক্ষেত্রে নতুন নতুন কর ছাড়ের সংস্থান আনা হয়েছিল। দেশি এবং বিদেশি বাণিজ্যিক সংস্থাগুলির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য কর কীভাবে কমেছে তা এক নজরে দেখে নেওয়া যাক ১ নং সারণিতে।

কেন্দ্রীয় কর কাঠামোয় ব্যাপক পরিবর্তন

● **আয়কর :** ভারতে অর্থনৈতিক সংস্কার শুরু হয় গত শতকের নব্বইয়ের দশকের গোড়ায়। ওই দশকের মাঝামাঝি কিন্তু অনেক উন্নয়নশীল দেশেই এই সংস্কারসাধনের কাজ প্রায় শেষ। সেসব জায়গায় আয়করের হারও তখন অনেক কম। মোটামুটি ১৫, ২৫ এবং ৩৫ শতাংশের মতো। ১৯৯৭-'৯৮ সালে ভারতেও ১০, ২০ এবং ৩০ শতাংশ আয়কর হার ধার্য করার আইনি সংস্থান গৃহীত হয়। কর্মদক্ষ ব্যবস্থাপত্র গড়ে তোলার লক্ষ্যে আয়কর হার হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে হারের রকমফের এবং পার্থক্যও কমানো হয়।

পূর্ব এশিয়া এবং লাতিন আমেরিকা-সহ উন্নয়নশীল দুনিয়ায় প্রায় সব দেশেই বাণিজ্যিক সংস্থাগুলির আয়কর বা কর্পোরেট আয়করের হার কমানো হয়েছে। প্রশাসনিক সুবিধা এবং কর প্রদান বাড়ানো ছিল এর লক্ষ্য। বিশ্বায়ন এবং উদার অর্থনীতির সূত্রে দেশ-বিদেশের সীমানা পেরিয়ে মূলধনের আনাগোনা বাড়াও যে কর হ্রাসের বড়ো একটা কারণ—একথা বলাই যায়। ভারতে দেশের এবং দেশের বাইরের—দু' ধরনের বাণিজ্যিক সংস্থার ক্ষেত্রেই আয়কর কমানো হয়। দেশি কোম্পানির ক্ষেত্রে তা কমিয়ে করা হয় ৩৫ শতাংশ এবং বিদেশি সংস্থার ক্ষেত্রে তা দাঁড়ায় চল্লিশ শতাংশে।

● **কেন্দ্রীয় অন্তঃশুল্ক এবং আমদানি বা বহিঃশুল্ক :** কেন্দ্রীয় অন্তঃশুল্ক আসলে এখন একটি মূল্যযুক্ত কর। এই বিবর্তন ঘটেছে দু' দশকেরও বেশি সময় ধরে। একেবারে শুরুতে, ১৯৮৬-'৮৭ সালে, কয়েকটি নির্দিষ্ট পণ্যের উৎপাদনে ব্যবহৃত কয়েকটি নির্দিষ্ট কাঁচামালের ক্ষেত্রে মূল্যযুক্ত কর বা VAT-এর মতো ব্যবস্থা চালু হয়। ১৯৯৪-'৯৫ সালে এর আওতায় আনা হয় মূলধনী পণ্যকে। এই কর ব্যবস্থার নাম দেওয়া হয় Modified VAT বা MODVAT। হারের বিভিন্নতা কমিয়ে ৮ এবং ১৬—এই দু'টি মাত্র হার চালু করার চেষ্টা চলতে থাকে। ২০০১ সালে MODVAT-এর নাম পালটে করা হয় Central VAT বা CENVAT।

● **কর প্রশাসন :** কর নীতি সংক্রান্ত কোনও সংস্কারকে সফল করে তোলার ক্ষেত্রে তিনটি বিষয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। করদাতার সংখ্যা বাড়ানো, কম্পিউটার ব্যবস্থার প্রসার এবং রাজ্য স্তরে VAT চালু করা। আয়কর দাতার সংখ্যা বেড়ে যাওয়াকে অবশ্যই কেন্দ্রীয় কর প্রশাসনের বড়ো সাফল্য বলা যেতে পারে। গত শতকের নব্বইয়ের দশকের মাঝামাঝি খাতায়-কলমে মোট আয়কর দাতার সংখ্যা ছিল ১ কোটি ৪০ লক্ষের কাছাকাছি। এর মধ্যে সক্রিয় করদাতার সংখ্যা ছিল ১ কোটি থেকে ১ কোটি ১০ লক্ষের মধ্যে। প্রাথমিক হিসেব অনুযায়ী, ১০০ কোটি জনসংখ্যার দেশে যাদের ওপর কর প্রযোজ্য

হওয়া উচিত, এমন মানুষের সংখ্যা ছিল ৩০ কোটি। গড়পরতা পরিবারের সদস্যসংখ্যা পাঁচ ধরলে করদাতার সংখ্যা দাঁড়ায় ৬ কোটি। কৃষির ওপর নির্ভরশীল ১ কোটি পরিবারকে বাদ দিলে দেখা যাচ্ছে, আয়কর দাতা পরিবারের সংখ্যা দাঁড়াচ্ছে ৫ কোটি। কাজেই, বলা চলে সম্ভাব্য করদাতাদের মাত্র ২০ শতাংশ ছিলেন কর ব্যবস্থার আওতায়।

গত শতকের নব্বইয়ের দশকের দ্বিতীয়ভাগে চালু স্বেচ্ছা আয়কর ঘোষণা প্রকল্পের আওতায় প্রদেয় করের পরিমাণ শূন্য হলেও উপার্জনকারীদের স্থাবর সম্পত্তি, টেলিফোন এবং বিদেশ ভ্রমণ সম্পর্কিত তথ্য জানানো বাধ্যতামূলক করা হয়।

আরও অনেক মানুষকে হিসেবের মধ্যে নিয়ে আসতে পরে আরও নানা বিষয় জানানো বাধ্যতামূলক করা হয়। ২০০০ সাল নাগাদ এসংক্রান্ত পঞ্জীতে নামের সংখ্যা বেড়ে ২ কোটি ছাড়িয়ে যায়। খুব কম সময়ের মধ্যেই সম্ভাব্য করদাতার সংখ্যা দ্বিগুণ হয়। ২০০৫ সালে খাতায় নাম ওঠে প্রায় তিন কোটি করদাতার। এর মধ্যে সক্রিয় করদাতার সংখ্যা ছিল প্রায় ২ কোটি ৫০ লক্ষ।

আসলে, কর সংস্কারের উদ্যোগ শুরু হয় আশির দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে। ১৯৮৫ সালে দীর্ঘমেয়াদি আর্থিক নীতি বা Long Term Fiscal Policy-র ঘোষণা করে সরকার। দেশের আর্থিক পরিস্থিতি যে খারাপের দিকে চলেছে তা স্বীকার করে নিয়ে এই নীতিতে কর কাঠামোর পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তার কথা বলা হয়। ওই দশকেই, কেন্দ্রীয় অন্তঃশুল্ক ব্যবস্থার পর্যালোচনা এবং সংস্কারসাধনের লক্ষ্যে দায়িত্ব দেওয়া হয় বিশেষজ্ঞদের একটি দলকে। ১৯৮৬ সালে চালু হয় Modified system of Value-Added Tax বা MODVAT। আমদানি বা বহিঃশুল্ক কাঠামোর সংস্কারের লক্ষ্যে পণ্যের বর্গীকরণের সমন্বয়যুক্ত ব্যবস্থা (Harmonized System of the classification of Goods)-ও চালু করা হয়।

পরে পরে, দেশের কর কাঠামোর পরিবর্তন ঘটিয়ে তাকে আন্তর্জাতিক কর ব্যবস্থার সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ করে তোলার পরিকল্পনা প্রণয়নের লক্ষ্যে দুই অভিজ্ঞ সরকারি আধিকারিকের নেতৃত্বে গড়ে দেওয়া হয় দু'-দুটো কমিটি। এগুলি হল রাজা চেল্লাইয়া কমিটি এবং বিজয় কেলকার কমিটি। উভয় কমিটির সুপারিশগুলিই ছিল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ এবং ঐতিহাসিক।

■ **রাজা চেল্লাইয়া কমিটি :** অধ্যাপক রাজা চেল্লাইয়ার নেতৃত্বাধীন কর সংস্কার কমিটি (Tax Reforms Committee—TRC) ১৯৯১, ১৯৯২ এবং ১৯৯৩, পর পর এই তিন বছর তিনটি প্রতিবেদন পেশ করে। সেখানে যেসব সুপারিশ করা হয়েছিল তা মোটামুটি এই রকম :

১. প্রান্তিক করের হার কমানোর মাধ্যমে ব্যক্তিগত কর কাঠামোর সংস্কার।

২. বাণিজ্যিক সংস্থাগুলির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য করের হার কমানো।

৩. আমদানি হওয়া কাঁচামালের খরচ কমানো।

৪. আমদানি শুল্ক হ্রাস।

৫. আমদানি শুল্কের হারের সংখ্যা কমানো এবং তাকে যুক্তিযুক্ত করা।

৬. অন্তঃশুল্ক ব্যবস্থার সরলীকরণ এবং তার সঙ্গে মূল্যযুক্ত কর ব্যবস্থার সংযুক্তি।

৭. পরিষেবা ক্ষেত্রে মূল্যযুক্ত কর বসিয়ে তাকে কর ব্যবস্থার আওতায় নিয়ে আসা।

৮. করদাতার সংখ্যা (tax base) বাড়ানো।

৯. কর তথ্য সম্পর্কিত ব্যবস্থা তৈরি এবং প্রয়োগ।

১০. কর প্রশাসনের কম্পিউটারের কর্মদক্ষতা বাড়ানো।

চেল্লাইয়া কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী যে সংস্কার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল তা এখনও চলছে। কর সংস্কারের ক্ষেত্রে আরও কিছু দিশানির্দেশের জন্য ২০০২ সালে গড়া হয় বিজয় কেলকার কমিটি।

■ **বিজয় কেলকার কমিটি :** ভারতে প্রত্যক্ষ কর ব্যবস্থায় সংস্কারের ক্ষেত্রে সাম্প্রতিকতম উদ্যোগগুলি নেওয়া হয়েছে ২০০২ সালে বিজয় কেলকারের নেতৃত্বে গঠিত প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর সংক্রান্ত কর্মীগোষ্ঠীর সুপারিশ অনুযায়ী। এই কর্মীগোষ্ঠীর মূল সুপারিশগুলি হল প্রত্যক্ষ করের অন্তর্ভুক্ত আয়করের ছাড়ের ঊর্ধ্বসীমা বাড়ানো, ছাড় দেওয়ার ক্ষেত্রে যুক্তিযুক্ততা, দীর্ঘমেয়াদি মূলধনী কর এবং সম্পত্তিকর রদ ইত্যাদি। প্রধান পরামর্শগুলি এই রকম :

➔ **প্রত্যক্ষ কর ব্যবস্থাপনায় :**

১. কর বিভাগের প্রদেয় পরিষেবার প্রসার ও গুণগত উন্নয়ন। করদাতারা যাতে ইন্টারনেট বা ই-মেলের মাধ্যমে কর বিভাগের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন তা নিশ্চিত করা।

২. PAN (Permanent Account Number) ব্যবস্থার প্রসার। প্রতিটি নাগরিকের PAN থাকা বাঞ্ছনীয়।

৩. সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা বা দমনমূলক পন্থার বিলোপ।

৪. বকেয়া বিষয়গুলির দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য তথ্য নিবন্ধীকরণ বা Date Entry-র কাজে কর বিভাগের বাইরে অন্য সংস্থা বা কর্মী নিয়োগ (outsource)।

৫. রিটার্ন সংক্রান্ত কাজ এবং ফেরতযোগ্য অর্থ প্রদানের কাজ (Refund) চার মাসের মধ্যে সম্পন্ন করা। Refund পাঠানোর ক্ষেত্রেও outsourcing।

৬. কর তথ্য ব্যবস্থা বা Network তৈরি করা, যাতে কর সংগ্রহের কাজের আধুনিকীকরণ ও সরলীকরণ সম্ভব হয়। TDS বা TCS-এর ক্ষেত্রে এই Network বিশেষভাবে সহায়ক হবে।

৭. দেশ ছেড়ে যাওয়ার সময় কর প্রদান সংক্রান্ত শংসাপত্র নেওয়ার রীতির বিলোপ।

৮. কেন্দ্রীয় প্রত্যক্ষ কর পর্ষদ বা CBDT-র হাতে আরও প্রশাসনিক এবং আর্থিক ক্ষমতার সংস্থান।

➔ **ব্যক্তিগত আয়করের ক্ষেত্রে :**

১. সাধারণ নাগরিকদের জন্য আয়কর ছাড়ের ঊর্ধ্বসীমা বাড়িয়ে ১ লক্ষ টাকা করা। প্রবীণ নাগরিক এবং বৈধব্যের শিকার মহিলাদের ক্ষেত্রে তা আরও বাড়ানো।

২. কত আয়ে কত কর বসবে তা যুক্তিযুক্ত করা (Rationalization of Income Tax slabs)। ব্যক্তিগত আয়করে অধিকর বা Surcharge না বসানো।

৩. গৃহঋণের সুদে ভরতুকি দেওয়া (২ শতাংশ হারে)।

৪. পেনশন তহবিলে গ্রাহকের অর্থ জমা করার ক্ষেত্রে ৮০সিসিসি ধারার আওতায় কর ছাড়ের ঊর্ধ্বসীমা বাড়ানো।

➔ কর্পোরেট কর :

১. করের হার কমিয়ে দেশি সংস্থার ক্ষেত্রে ৩০ শতাংশ এবং বিদেশি সংস্থার ক্ষেত্রে ৩৫ শতাংশ করা।

২. শেয়ার বাজারে তালিকাভুক্ত বাণিজ্যিক সংস্থাগুলির লভ্যাংশ (Dividend) এবং মূলধনী লাভের ক্ষেত্রে কর বিলোপ।

৩. যন্ত্রপাতির অবচয় (Depreciation)-এর হার বাড়ানো।

৪. ন্যূনতম পরিবর্ত কর (Minimum Alternate Tax)-এর বিলোপ।

➔ সম্পদ কর :

১. সম্পদ করের বিলোপ।

এইসব সুপারিশ করা হয়েছিল ১৩ বছর আগে। তার অনেকগুলিই রূপায়িত হয়েছে।

প্রত্যক্ষ কর বিধির বিষয়ে সরকার তাড়াহুড়ো করছে না। তার কারণ, সংস্থানগুলির বেশিরভাগই আয়কর আইনের অন্তর্ভুক্ত। পরোক্ষ করের ক্ষেত্রে এযাবৎ সবচেয়ে বড়ো সংস্কার হল পণ্য ও পরিষেবা কর বা GST। গত বছর পয়লা এপ্রিল থেকে তা চালু হয়ে গেছে।

প্রত্যক্ষ কর ক্ষেত্রে প্রধান প্রধান সংস্কার

● **কর তথ্য ব্যবস্থা (Tax Information Network—TIN) :** আয়কর দপ্তরের হয়ে এই TIN তৈরি করেছে National Securities Depository Limited বা NSDL। এই TIN হল সারা দেশের কর সংক্রান্ত তথ্যভাণ্ডার। তথ্যপ্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে কর সংগ্রহ প্রণালীর আধুনিকীকরণ, প্রক্রিয়াকরণ, নজরদারি, প্রত্যক্ষ কর সংক্রান্ত হিসেবনিকাশের লক্ষ্যেই তা তৈরি করা হয়েছে। TIN-এর আওতায় আছে তিনটি উপপ্রণালী—ERACS, OLTAS এবং CPLGS।

■ **বৈদ্যুতিন প্রত্যর্পণ এবং একত্রীকরণ প্রণালী (Electronic Return Acceptance and Consolidation System বা ERACS) :**

করদাতাদের সঙ্গে তথ্যের আদানপ্রদানের (TIN Facilitation Centre বা TINFC); পাশাপাশি বৈদ্যুতিন প্রক্রিয়ায় TDS (Tax Deduction at Source), TCS (Tax Collection at Source) ও AIR (Annual Information Return) সংক্রান্ত তথ্যাদি TIN-এর কেন্দ্রীয় প্রণালীতে পাঠানো হয় ERACS-এর মাধ্যমে।

■ **অনলাইনে কর সংক্রান্ত হিসেবনিকেশ (Online Tax Accounting System—OLTAS) :**

দৈনিক ভিত্তিতে দেশের বিভিন্ন কেন্দ্রে সংগৃহীত করের বিশদ TIN-এর মূল প্রণালীতে পাঠানো হয় OLTAS-এর মাধ্যমে।

■ **কেন্দ্রীয় প্যান লেজার জেনারেশন সিস্টেম (Central PAN Ledger Generation System—CPLGS) :**

এই প্রণালীর মাধ্যমে TDS/TCS এবং পূর্বে প্রদত্ত কর (Advance Tax) সংক্রান্ত তথ্যাদি সংশ্লিষ্ট কর গ্রাহকের PAN-এর সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়।

TDS-এর অর্থ হল Tax Deduction বা উৎসে কর প্রয়োগ। এক্ষেত্রে প্রাপককে অর্থ প্রদানের সময়েই কর সংগ্রহ করে নির্দিষ্ট কোনও ব্যাঙ্কের শাখায় তা জমা রাখা হয়। এই কাজটি করে তৃতীয় কোনও এক পক্ষ। ২০০৪-'০৫ সাল থেকে সরকার, বাণিজ্যিক সংস্থা-সহ সকলের ক্ষেত্রেই বৈদ্যুতিন প্রণালীতে TDS রিটার্ন দাখিল করা বাধ্যতামূলক হয়েছে।

TCS হল Tax Collection at source বা উৎসে কর সংগ্রহ। এক্ষেত্রে লেনদেনের সময়েই বিক্রেতা ক্রেতার থেকে কর সংগ্রহ করেন। ২০০৫ সালের 'Electronic Filing of Returns of Tax Collected at Source Scheme' অনুযায়ী এবাবদ সংগৃহীত অর্থ বৈদ্যুতিন মাধ্যমে বা সরাসরি NSDL-এ জমা করতে হয়। এই বিক্রেতা সরকার বা বাণিজ্যিক সংস্থা যেই হোক না কেন, সকলের ক্ষেত্রেই একই নিয়ম প্রযোজ্য।

প্রত্যক্ষ কর ব্যবস্থার সংস্কারে অন্যান্য পদক্ষেপ

● **ই-সহযোগ উদ্যোগ বা কাগজের ব্যবহারবিহীন মূল্য নির্ণয় :** তথ্যপ্রযুক্তি করদাতাদের অনেক সুবিধা করে দিয়েছে। ব্যাঙ্কে গিয়ে চালান এবং প্রয়োজনীয় যাবতীয় নথি জমা দেওয়ার ঝক্কি এখন নেই। কর প্রদান প্রক্রিয়া আরও সরল করতে কেন্দ্রীয় প্রত্যক্ষ কর পর্ষদ বা CBDT সম্প্রতি আয়কর সংক্রান্ত মূল্যায়নের কাজে কাগজের ব্যবহার আরও কমিয়ে ই-মেল-এর মাধ্যমেই সবকিছু সম্পন্ন করার প্রস্তাব দিয়েছে। তা কার্যকর হলে আয়কর দপ্তরে যাওয়ার আর কোনও প্রয়োজনই হবে না। সীমিত পরিসরে প্রাথমিকভাবে এই প্রকল্পে মুম্বই, দিল্লি, চেন্নাই, কেঙ্গালুরু এবং আমেদাবাদে কাজ চালুও হয়ে গেছে।

● **সেবোত্তম : অভিযোগ নিষ্পত্তি সংক্রান্ত দক্ষ ব্যবস্থাপনা :** করদাতাদের অভিযোগের নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে দীর্ঘসূত্রিতা দূর করতে তৈরি করা হয়েছে 'সেবোত্তম' মঞ্চ। এই মঞ্চে দেশের সব আয়কর দপ্তর সংযুক্ত। কর সংক্রান্ত প্রশ্নের সমাধানও এখানে মেলে

● **দ্রুত প্রত্যর্পণ :** কর প্রত্যর্পণ বা tax refund-এর কাজ ১০-টি কাজের দিনের মধ্যে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে কাজ করছে আয়কর দপ্তর। আয়কর রিটার্ন পরীক্ষা করার ক্ষেত্রে আধার অথবা ব্যাঙ্কের তথ্যপঞ্জী ব্যবহারের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

● **পূর্বে পূরণ করা ITR ফর্ম :** অনলাইনে ITR ফর্ম ভরে জমা দেওয়ার সংস্থান থাকলেও অনেকেই এখনও তা ডাউনলোড করে চিরাচরিত পথেই জমা দিয়ে থাকেন। আয়কর দপ্তর এখন আগেই পূরণ করা প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সম্বলিত ফর্ম দেওয়ার ব্যবস্থা করছে। তাতে ডাউনলোড করা ফর্মে করদাতার অনেক তথ্য আগে থেকেই ছাপা থাকবে।

● **PAN শিবির :** PAN-এর ব্যবহার আরও বাড়াতে সরকার দেশের নানা প্রান্তে PAN শিবিরের আয়োজন করছে। আয়কর বাণিজ্য প্রয়োগ স্থায়ী সংখ্যা বা Income Tax Application Permanent Account Number (ITBA-PAN) পোর্টাল চালু করার প্রস্তাবও রয়েছে। এই পোর্টালের মাধ্যমে অনলাইনে PAN-এর জন্য আবেদন জানানো যাবে। তা মিলেও যাবে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে।

পরোক্ষ কর সংস্কার

১৯৮৬ সালে কয়েকটি নির্বাচিত পণ্যের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় অন্তঃশুল্কের বদলে রূপান্তরিত

মূল্যযুক্ত কর বা MODVAT চালু হওয়া ভারতে প্রথম পরোক্ষ কর সংক্রান্ত সংস্কার। পরে, সব পণ্যের ক্ষেত্রেই তা চালু হয়। তখন এর নাম হয় কেন্দ্রীয় মূল্যযুক্ত কর বা Central Value Added Tax—CENVAT। রাজ্যগুলিও বিক্রয় করের বদলে ক্রমে চালু করে মূল্যযুক্ত কর বা VAT।

পরোক্ষ কর সংস্কারে প্রধান উদ্যোগগুলি হল :

➔ **আমদানি শুল্ক হ্রাস** : ১৯৯০ সালে অকৃষিজ পণ্যের ক্ষেত্রে আমদানি বা বহিঃশুল্কের হার ছিল ১২৮ শতাংশ। ধীরে ধীরে এই হার কমানো হয়েছে। এখন গড়পড়তায় তা ১১-১২ শতাংশ। তবে আমদানি শুল্কর সর্বোচ্চ হার হল ১৫০ শতাংশ; সর্বনিম্ন শূন্য শতাংশ।

➔ **কেন্দ্রীয় অন্তঃশুল্ক :** কেন্দ্রীয় অন্তঃশুল্কের জায়গায় প্রথমে চালু হয় MODVAT। এখন CENVAT-এর জমানা। হারের বিভিন্নতাও কমানো হয়েছে।

➔ **পরিষেবা কর** : ১৯৯৪-'৯৫ সালে সীমিত কয়েকটি ক্ষেত্রে পরিষেবা কর চালু হয়। তখন হার ছিল সাত শতাংশ। পরে এই হার বাড়ানো হয়। করের আওতায় নিয়ে আসা হয় আরও অনেক ধরনের পরিষেবাকে। এখন প্রায় ১০০ ধরনের পরিষেবায় কর দিতে হয়। হার ১৪ শতাংশ।

➔ **পণ্য ও পরিষেবা কর, GST :** GST হল দেশের সবচেয়ে বড়ো মাপের কর সংস্কার, বলা হচ্ছে এমনটাই। তা প্রয়োগের ক্ষেত্রে প্রথমে কিছু সমস্যা দেখা দেয়। কেন্দ্রের NDA সরকার তার সমাধানের উদ্যোগ নিয়ে করদাতাদের অসুবিধা দূর করার প্রয়াসী। বেঙ্গালুরুর International Tax Research and Analysis Foundation—ITRAF-এর চেয়ারম্যান, বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ পার্থসারথী সোম কিন্তু ভিন্ন মত পোষণ করেন। প্রাক্তন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী পি. চিদম্বরমের একজন উপদেষ্টা বলেছেন, প্রস্তাবিত GST কাঠামো এসংক্রান্ত ধ্যানধারণার সঙ্গে যত বেশি করে সাযুজ্যপূর্ণ হবে ততই

মূলগত দিক থেকে কর সংস্কারের স্বপ্ন বাস্তবায়িত হবে। প্রস্তাবিত GST কাঠামো পর্যালোচনা করলে কিন্তু একে স্বাধীনতার পর সবচেয়ে বড়ো কর সংস্কার হিসেবে ভাবা কঠিন।

১৯৯৬-'৯৭ সালে আয়কর কাঠামোর ব্যাপক সংস্কারসাধন হয়েছিল। করে হার কমে ৩০, ২০ এবং ১০ শতাংশ হওয়ায় কর্মসংস্কৃতি এবং রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে যথেষ্ট ইতিবাচক প্রভাব পড়েছিল সেসময়। এর এক দশক পরে রাজ্যস্তরে মূল্যযুক্ত কর বা VAT চালু হয়। আর্থিক ক্ষেত্রে কেন্দ্র-রাজ্য সহযোগিতার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ এই VAT। রাজ্যের বিক্রয় কর ব্যবস্থাকেও তা সম্পূর্ণ বদলে দেয়। রাজস্ব বৃদ্ধি পায়। হাওয়া লাগে ব্যবসা-বাণিজ্যের পালে।

বেশিরভাগ কর বিশেষজ্ঞই অবশ্য মনে করেন পণ্য পরিষেবা কর বা GST এবং প্রত্যক্ষ কর বিধি বা DTC চালু হওয়া সরকারের তরফে এখনও পর্যন্ত সবচেয়ে বড়ো কর সংস্কার। এর ফলে কর প্রদানে গতি আসবে। সুবিধা হবে দেশ-বিদেশের লগ্নিকারীদের। DTC এবং GST, কর ব্যবস্থার সরলীকরণ, করদাতার সংখ্যা বৃদ্ধি, এবং মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের নিরিখে কর রাজস্বের অনুপাত বাড়াতে (Tax Buoyancy) সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলবে বলে তাদের আশা। এর ফলে দেশের আর্থিক ঘাটতিও কমবে। সরল কর ব্যবস্থা এদেশকে বিনিয়োগের অন্যতম আকর্ষণ কেন্দ্র করে তুলবে বলেও বিশেষজ্ঞরা মনে করেন। মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের হার বাড়ানো এবং মানুষের হাতে অর্থের জোগান বৃদ্ধিতেও সরকারের এইসব পদক্ষেপ কার্যকরী ভূমিকা নেবে বলে মনে করছে অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞ মহল।❑

সূত্র :

কর সংস্কার সংক্রান্ত বিভিন্ন গবেষণাপত্র (পার্থসারথী সোম এবং অন্যদের)। UPSC/IAS-এর জেনারেল স্টাডিজ। সংবাদ মাধ্যমের খবর।

সিদ্ধ যোগ

ড. আর. এস. রামস্বামী

আধুনিক অন্যান্য চিকিৎসা ব্যবস্থার মতো সিদ্ধ মতে চিকিৎসা পদ্ধতির উদ্দেশ্য শুধু শরীর ও মনের রোগব্যাধির নিরাময় নয়। বিশুদ্ধির মাধ্যমে আত্মার নিরাময় সাধনও এর মধ্যে পড়ে, যা এগিয়ে দেয় পরমার্থ মার্গ অভিমুখে। এই বক্তব্যের শেষ বাক্যটির মধ্যে ইঙ্গিত মেলে যে, আধ্যাত্মিক স্বাস্থ্যের জন্যও সিদ্ধ মতের চিকিৎসাশাস্ত্রে সংস্থান রয়েছে। রোগমুক্ত জীবনযাপনের জন্য যোগাভ্যাসের উপর জোর দিয়েছেন থিরুমুলার। থিরুমুলারের মতে, আটটি অঙ্গ নিয়ে যোগ সংগঠিত হয়েছে বলে একে অষ্টাঙ্গ যোগ বলা হয়।

'যোগ' শব্দের অর্থ মিলন বা সংযুক্তি (Union); অর্থাৎ কিনা এখানে বলা হচ্ছে, 'পরম' বা সর্বজনীন সত্তার সাথে 'জীবন' বা ব্যক্তিসত্তার মিলেমিশে একাকার হয়ে যাওয়ার কথা। এটিই মনুষ্যজন্মের চরম লক্ষ্য বা মোক্ষ। আরেক অর্থে যোগের মানে মানুষের পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের উপর নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে মনোজগৎকে এক একক সত্তা অভিমুখে নিবিষ্ট করা ও মোক্ষপ্রাপ্তি। অষ্টাদশ সিদ্ধপুরুষের অন্যতম সিদ্ধর থিরুমুলার তার রচিত কাব্যগ্রন্থ "থিরুমানথিরাম"-এ যোগ বিষয়টির বিভিন্ন দিক বিশদে তুলে ধরেছেন। বর্তমান নিবন্ধে যোগ বিষয়ে সিদ্ধর থিরুমুলারের কিছু গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণের উপর আলোকপাত করা হয়েছে। যা কিনা সিদ্ধ মতে চিকিৎসা পদ্ধতির এক অন্যতম অঙ্গ।

সিদ্ধ মতে ভেষজবিদ্যা বা চিকিৎসা পদ্ধতিকে সিদ্ধর থিরুমুলার তার রচিত থিরুমনথিরাম-এ এভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন :

যে-বস্তু শারীরিক কোনও অসুস্থতার নিরাময় করে তা-ই হল ভেষজ বা ওষুধ

যে-বস্তু কোনও শারীরবৃত্তীয় অসুস্থতার নিরাময় সাধন করে তা-ই হল ভেষজ বা ওষুধ

যে-বস্তু কোনও অসুস্থতা প্রতিরোধ করে তা-ই হল ভেষজ বা ওষুধ

যে-বস্তু অমরত্ব প্রদান করে তা-ই হল ভেষজ বা ওষুধ।

আধুনিক অন্যান্য চিকিৎসাব্যবস্থার মতো সিদ্ধ মতে চিকিৎসা পদ্ধতির উদ্দেশ্য শুধু শরীর ও মনের রোগব্যাধির নিরাময় নয়। বিশুদ্ধির মাধ্যমে আত্মার নিরাময়সাধনও এর মধ্যে পড়ে, যা এগিয়ে দেয় পরমার্থ মার্গ অভিমুখে। এই বক্তব্যের শেষ বাক্যটির মধ্যে ইঙ্গিত মেলে যে, আধ্যাত্মিক স্বাস্থ্যের জন্যও সিদ্ধ মতের চিকিৎসাশাস্ত্রে সংস্থান রয়েছে। রোগমুক্ত জীবনযাপনের জন্য যোগাভ্যাসের উপর জোর দিয়েছেন থিরুমুলার। থিরুমুলারের মতে, আটটি অঙ্গ নিয়ে যোগ সংগঠিত হয়েছে বলে একে অষ্টাঙ্গ যোগ বলা হয়।

অষ্টাঙ্গ যোগ

যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান এবং সমাধিকে একত্রে অষ্টাঙ্গ যোগ বলা হয়। অর্থাৎ, কিনা এগুলি হল যোগের আটটি ধাপ বা অঙ্গ। সিদ্ধ মতের চিকিৎসাশাস্ত্রে 'কায়াকল্প' (পুনরুজ্জীবন থেরাপি) এক গুরুত্বপূর্ণ চিকিৎসা পদ্ধতি। একে 'কল্পঅভিজাত' এবং 'কল্পযোগ' এই দুই শ্রেণিতে ফেলা যায়। রোগ প্রতিরোধক ও রোগ নিরাময়ক, এই দুই গোত্রের ভেষজ বা ওষুধের নিদান দেওয়া হয় কল্পঅভিজাত চিকিৎসা পদ্ধতিতে। অন্যদিকে, কল্পযোগের কারবার বিভিন্ন যোগ শৈলী নিয়ে, যার অভ্যাসে শরীর, মন এবং আত্মা দীর্ঘকাল ধরে চাঙ্গা/সুস্থসবল থাকে। থিরুমুলারের মত অনুযায়ী, যোগের প্রথম ভাগ বা অঙ্গ হল, 'যম' তথা অন্তিম ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ

[লেখক মহানির্দেশক, কেন্দ্রীয় সিদ্ধা গবেষণা পর্ষদ, AYUSH মন্ত্রক, ভারত সরকার। ই-মেল : dr.rsramaswamy@gmail.com]

অঙ্গ হল, 'সমাধি', যা কিনা মনুষ্যজন্মের প্রকৃত লক্ষ্য।

- **যম :** ইন্দ্রিয়লালসা, ক্রোধ, হিংসা, এবং আত্ম-অহংকারের মতো অশুদ্ধি থেকে চিত্তকে মুক্ত করে মানুষকে সুস্থ মানসিক স্থিতির মার্গে এগিয়ে দেয় এই অনুশীলন। যে মানুষের মন উল্লিখিত অশুদ্ধি থেকে মুক্ত থাকে, তা রোগের থাবা থেকেও মুক্ত থাকে।
- **নিয়ম :** এই অভ্যাস ঊষালগ্নে শয্যাত্যাগ থেকে শুরু করে রাত্রে শয্যাগ্রহণ পর্যন্ত মানুষের দৈনন্দিন যাবতীয় কাজকর্মে এক সুস্থ শৃঙ্খলাবদ্ধ ছন্দ নিয়ে আসে। 'নিয়ম' কথাটির সরল অর্থ হল, কারও কাজকর্মে নৈতিক শুদ্ধতা বজায় রাখা। নিয়ম মানুষের কর্মের জগতে এক সুস্থ পরিবেশ সুনিশ্চিত করে।
- **আসন :** নির্দিষ্ট সময়ের জন্য এক বিশেষ ভঙ্গিমায় দেহকে বিন্যস্ত বা স্থাপিত করে শরীরকে সুস্থ ও নিশ্চল অবস্থানে রাখার অনুশীলনই হল আসন। এর সহজ মানে হল দেহের ভঙ্গিমা (Pose) ও অঙ্গবিন্যাস (Posture)। থিরুমুলারের মতে এরকম হাজার হাজার অঙ্গবিন্যাসের রকমফের রয়েছে। আসন অনুশীলনের মাধ্যমে বহু রোগব্যাধি প্রতিরোধ এবং মানুষের শরীরস্বাস্থ্যের উন্নতি সম্ভব। আসন মানুষের ভগ্নস্বাস্থ্য সারিয়ে তুলে তাকে তরতাজা করতেও বেশ কার্যকরী উপায়। শারীরিক কসরত বা ব্যায়ামের ক্ষেত্রে শরীরের এনার্জি বা শক্তিক্ষয় হয়, বিপরীতে আসন অনুশীলনের মাধ্যমে এনার্জি, বিশেষত, জৈব-চুম্বকীয় শক্তি শরীরে প্রবেশ করে। আসনের অনুশীলনের ফলে শুধুমাত্র মানুষের শরীরের বাহ্যিক কাঠামো তথা অতিরিক্ত মাংসপেশিই সুগঠিত হয় না; দেহের অভ্যন্তরীণ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, বিশেষ করে হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস, যকৃত, প্লীহা, কিডনি এবং বৃক্ক তথা জরায়ু কাজকর্মও সুষ্ঠুতালে সম্পাদিত হতে থাকে। এইসব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গই বিভিন্ন গ্রন্থি থেকে উৎসেচক, হরমোন ইত্যাদির নিঃসরণ নিয়ন্ত্রণ করে; খাদ্যের পাচন প্রক্রিয়া ও শরীর থেকে বর্জ্য পদার্থ নিষ্কাশন প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে;

তথা সুষ্ঠুভাবে রক্তসংবহন, শ্বাসকার্য ও শরীরের তাপমাত্রা রক্ষায় সাহায্য করে। শরীরের অন্তক্ষরা গ্রন্থিগুলির কাজকর্মও এরাই নিয়ন্ত্রণ করে, যার উপর কিনা মানুষের গোটা জীবনটাই নির্ভরশীল। রোগের প্রতিরোধ ও নিরাময়ের ক্ষেত্রে আসন অনুশীলন হয় সাহায্য করে অথবা মূল থেরাপি হিসাবে কাজ করে। আসন অভ্যাস করলে মানুষের শরীরের রক্তবাহ, স্নায়ু এবং মাংসেপেশি কখনই দড়কচা মেরে যায় না, যেটা কিনা শারীরিক কসরতের ক্ষেত্রে হামেশাই ঘটে। বরং আসনের দৌলতে এগুলি আরও বেশি নরম ও নমনীয় হয়ে ওঠে।

- **প্রাণায়াম :** এ হল কোনও মানুষের শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণের কৌশল অনুশীলন। প্রাণায়ামের অনুশীলনের দৌলতে মানুষের শরীরে শ্বাস-প্রশ্বাসজনিত যে অসংখ্য কসরত সংঘটিত হয়, তা আমাদের শরীরের কোষ-কলায়, বিশেষত স্নায়ুতন্ত্রে এনার্জি বা শক্তি জোগায়। থিরুমুলার প্রাণায়ামকে বর্ণনা করেছেন নির্দিষ্ট হিসাবনিকাশ কষে মানুষের শরীরে শ্বাসক্রিয়া নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি হিসাবে। প্রাণায়ামের অনুশীলন মৃত্যুর দেবতা যমকে তফাতে রাখে। প্রকৃতিগত দিক থেকে প্রতিরোধক ও নিরাময়মূলক তো বটেই, প্রাণায়াম শরীর ও মনকে তরতাজা করে তুলতেও সমানভাবে কার্যকরী। ফুসফুসের কর্মক্ষমতা বাড়িয়ে তা দেহকোষে পর্যাপ্ত অক্সিজেনের জোগান সুনিশ্চিত করে। একে 'বাসি' বা 'বাসিযোগ'-ও বলা হয়। থিরুমুলার প্রাণায়ামের তিন প্রক্রিয়া, অর্থাৎ পূরক (শ্বাসগ্রহণ), কুম্ভক (শ্বাসধারণ) এবং রেচক (শ্বাসত্যাগ); এই তিন ক্রিয়া প্রতিবার কত সময় ধরে অনুশীলন করতে হবে, সেই কাল-পরিমাণ স্থির করে দিয়েছেন। এগুলি হল যথাক্রমে ১৬ মাথিরাই, ৬৪ মাথিরাই এবং ৩২ মাথিরাই। উল্লেখ্য, মাথিরাই হল প্রাচীনকালে তামিল ইতিহাসে সময় গণনার একক। ১ মাথিরাই হল ০.২৫ সেকেন্ডের সমান।
- **প্রত্যাহার :** মানুষের শরীরে দর্শন, শ্রবণ, স্বাদ, ঘ্রাণ ও স্পর্শ ইত্যাদি পঞ্চক্রিয়া সাধক পঞ্চ ইন্দ্রিয় হল চক্ষু, কর্ণ, জিহ্বা, নাসিকা ও ত্বক। এই পঞ্চ ইন্দ্রিয়কে নিয়ন্ত্রণ, অর্থাৎ তাদের ক্রিয়াশীল অবস্থা থেকে মনের একাগ্র ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে প্রত্যাহার করে নেওয়া বা ফিরিয়ে নেওয়ার কৌশল অনুশীলনকে বলা হয় প্রত্যাহার। 'জ্ঞানেনথিরিয়াঙ্গাল' (এটি একটি তামিল শব্দ, যার অর্থ "Organs of perception") ইন্দ্রিয়ানুভূতি ও জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলির মধ্যে এক যোগসূত্র স্থাপিত করে। বলা যেতে পারে,

জ্ঞানেনথিরিয়াঙ্গালার হল সেই যন্ত্র, জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলির মধ্যে দিয়ে যা ইন্দ্রিয়ানুভূতি জাগরিত করে। সিদ্ধশাস্ত্র মতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তথা মানুষও তৈরি হয়েছে পঞ্চভূত বা পাঁচটি বস্তুর সমাহারে। এগুলি হল, ক্ষিতি বা মাটি, অপ্ বা জল, তেজঃ বা অগ্নি, মরুৎ বা বাতাস এবং ব্যোম বা আকাশ। এদিকে মানুষের পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় হল চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক এবং পাঁচটি ইন্দ্রিয়ানুভূতি হল দর্শন, শ্রবণ, স্বাদ, ঘ্রাণ ও স্পর্শ। পঞ্চভূত দ্বারা জীবদেহ কীভাবে গঠিত হয়, এবারে আসা যাক সে প্রসঙ্গে। পঞ্চভূতের পাঁচটি গুণ, শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধ। ব্যোম, অর্থাৎ আকাশ; আকাশের গুণ শব্দ; স্থিতি কর্ণে। মরুৎ, অর্থাৎ বায়ু; বায়ুর গুণ স্পর্শ; স্থিতি ত্বকে। তেজঃ অর্থাৎ অগ্নি; অগ্নির গুণ রূপে; স্থিতি চক্ষুতে। অপ্ অর্থাৎ জল; জলের গুণ রস, স্থিতি জিহ্বায়। ক্ষিতি অর্থাৎ মাটি; মাটির গুণ গন্ধ; স্থিতি নাসিকায়।

মানুষের অবশ্য একটি ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়াও কাজ করে। তামিল ভাষার লিখিত প্রাচীনতম ব্যাকরণ ও সাহিত্য বিষয়ক গ্রন্থ থোলকাপ্পিয়াম (Tholkappium)-এ লেখা আছে, 'Mavum Makkalum Iyarivinave Makkalthameararivuyire', অর্থাৎ, অন্যান্য জীবিত বস্তুর থেকে মানুষ ভিন্নতর তথা শ্রেষ্ঠতর এই ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ানুভূতির অধিকারী হওয়ার দৌলতে। এটি হল তার বোধশক্তি (Power of Reasoning)। পাপের পথ পরিহার করে সুশৃঙ্খল জীবনযাপনের মার্গে তাকে চালিত করে, যা তাকে মোক্ষ অর্জনের সুযোগ করে দেয়। এই মোক্ষই হল মনুষ্যজন্মের প্রকৃত ও অন্তিম প্রাপ্তি। এছাড়াও নৈতিক তত্ত্বের উপর লিখিত গবেষণাগ্রন্থ, "থিরুক্কুরাল" রচয়িতা থিরুভাল্লুভার বলেছেন, 'Suvai olioooruosainatramendruainthin Vahaitherivankatteulagu', অর্থাৎ কিনা, নিজেদের পঞ্চ ইন্দ্রিয়ানুভূতিকে বিচক্ষণতার সাথে ব্যবহার করে কাজ করে যাওয়ার মতো ক্ষমতাধর মানুষজনের জ্ঞানের সূত্রেই এই বিশ্বসংসারের কাজকর্ম সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হচ্ছে। সিদ্ধপুরুষ পাথিরাক্রিয়ার বলেছেন, এই পঞ্চ ইন্দ্রিয়ানুভূতির নিয়ন্ত্রণ বা প্রত্যাহার করে তোমার অহংকে পরাভূত কর, তোমার পঞ্চ ইন্দ্রিয়ানুভূতিকে ভস্মীভূত কর এবং ধ্যানের অতলে তলিয়ে যাও; তাহলেই তুমি উত্তীর্ণ হবে আত্ম-উপলব্ধির চরম ধাপে।

ইন্দ্রিয়ানুভূতির মাধ্যমে ভোগ মাত্রা না ছাড়িয়ে একটা সীমার মধ্যে থাকা উচিত; কারণ তা না হলে জীবনীশক্তির অযথা অপচয় হয়। সিদ্ধপুরুষেরা তাদের ইন্দ্রিয়ানুভূতিকে পুরোপুরি প্রত্যাহার করে এই জীবনীশক্তিকে দীর্ঘ সময়ের জন্য সংরক্ষিত করে রাখেন। তারা দীর্ঘজীবী হন; পবিত্র স্বর্গীয় জ্ঞানার্জন করেন সহজেই এবং অন্যান্যদের সেবার জীবন অতিবাহিত করেন। থিরুভাল্লুভার ইন্দ্রিয়ানুভূতির নিয়ন্ত্রণ ও প্রত্যাহারের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করেছেন এই ভাষায়, "যে ব্যক্তি তার বোধশক্তির বিশ্লেষণের দ্বারা পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে ক্রিয়াশীল ইন্দ্রিয়ানুভূতিকে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হয়েছেন, ধরে নিতে হবে তার মোক্ষলাভের বীজতলা প্রস্তুত।"

- **ধারণ** : ধারণ হল মনঃসংযোগ বা একাগ্রতা অনুশীলনের পদ্ধতি। ধ্যান বা মেডিটেশনের জন্য পূর্বশর্ত হল মনের একাগ্রতা বৃদ্ধির কৌশল হিসাবে ধারণ অভ্যাস।
- **ধ্যান** : এ হল মনের উপর পরিপূর্ণ নিয়ন্ত্রণ (প্রভুত্ব) অর্জনের কলা। একটি ছাড়া বাকি সমস্ত চিন্তাভাবনাকে পরিত্যাগ করার প্রক্রিয়া হিসাবেও ব্যাখ্যা করা যায় ধ্যানকে।

  কোনও যোগ বিশেষজ্ঞের তত্ত্বাবধানে, সমতল ভূমিতলের উপর নরম আসন জাতীয় কিছু বিছিয়ে সুখাসন বা পদ্মাসনে বসে কোনও ব্যক্তি প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যায়-রাতের বেলা গড়ে ২০ থেকে ৩০ মিনিট ধরে ধ্যান বা মেডিটেশন অভ্যাস করলে, রোগব্যাধি প্রতিরোধ ও নিরাময় ক্ষমতা গড়ে উঠবে তার মধ্যে, বিশেষ করে মানসিক উদ্বেগজনিত রোগের হাত থেকে রেহাই পাবেন সহজেই। ধ্যান আমাদের সারাটা দিন ধরে তরতাজা রাখে, যাদের অনিদ্রা বা ঘুম পাতলা জাতীয় সমস্যা আছে তাদের ক্ষেত্রে অঘোরে ঘুম নিশ্চিত করে, সমস্যার মুখোমুখি হয়ে জোরালোভাবে তার সঠিক সমাধান করার মতো মানসিক শক্তি জোগায় মানুষকে। ধ্যান দিনের যেকোনও সময়ই করা যায়; তবে খুব সকালবেলা এবং সূর্যাস্তের সময়, অর্থাৎ সন্ধ্যাবেলা ধ্যান করার জন্য সেরা সময় বলে মনে করা হয়। এসময় ধ্যান করলে সবচেয়ে বেশি সুফল মেলে। ধ্যান করার সময় উত্তর বা পূর্ব দিকে মুখ করে বসা উচিত।
- **সমাধি** : সমাধি হল অষ্টাঙ্গ যোগের শেষ পর্যায়। সম + অধি; অর্থাৎ কিনা, ঈশ্বরের সমগোত্রে পৌঁছে যাওয়া। আমরা তামিলে প্রচলিত "পতি, পশু, পশম" (পতি অর্থাৎ ঈশ্বর; পশু অর্থাৎ যার মধ্যে আত্মা আছে, মানুষ সমেত এমন যেকোনও জীবিত বস্তু; পশম অর্থাৎ নশ্বর বস্তু, যা চিরস্থায়ী নয়), এই দার্শনিক তত্ত্বের মাধ্যমে বিষয়টির ব্যাখ্যা করতে পারি। এই তত্ত্ব অনুযায়ী সমাধি এমন এক পর্যায়, যখন পশু, অর্থাৎ জীবন (বা জীবাত্মা) নিজেকে পশমের (পার্থিব বন্ধন) থেকে মুক্ত করে একজন পতি, অর্থাৎ পরমাত্মা হয়ে ওঠে।

  সমাধিকে চিন্তাহীন আত্মমগ্নতাও (Self-meditation) বলা যেতে পারে। অর্থাৎ কিনা এ হল আত্মার নির্ভীক স্থিতি, যে আত্মা ইন্দ্রিয়ানুভূতি ও জ্ঞানেন্দ্রিয় সমেত এক দেহের মধ্যে বাস করছে বটে, কিন্তু সেই শরীর থেকে সে আক্ষরিক অর্থে পৃথক। নিজেকে তথা চারপাশের সমগ্র বস্তুজগৎ সম্পর্কে বিস্মরণের পরম পর্যায় এটি। এক পুরোপুরি অনুভূতি এবং চেতনা রহিত ধাপ তা। এই হল সমাধি।
- **রাজযোগ** : সিদ্ধপুরুষেরা রাজযোগের ব্যাপারেও ব্যাখ্যা দিয়েছেন। এর অর্থ, মূলাধার থেকে কুণ্ডলিনী শক্তি জাগ্রত করে পরম সুখাবস্থায় উন্নীত হওয়া।

পরিশেষে, একটা কথা উল্লেখ না করলেই নয়, প্রতিবছর ২১ জুন তারিখে আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উদ্‌যাপনের উদ্যোগের মধ্যে দিয়ে ভারত তার নিজস্ব আধ্যাত্মিক বিজ্ঞান "যোগ"-কে গোটা বিশ্বের দরবারে ঘরে-বাইরে শান্তি ও একতা বজায় রাখার মাধ্যম করে তুলতে পারায় আজ যারপরনাই গর্বিত।❑

নারী ও শিশু সুরক্ষায় : সরকারের অগ্রাধিকার

রাকেশ শ্রীবাস্তব

ভারতীয় নারীদের যদি জনজীবনে সর্বাত্মক অংশগ্রহণ করে অর্থনৈতিক বিকাশে অবদান রাখতে হয় তাহলে সবার আগে তাদের মধ্যে নিরাপত্তা ও সুরক্ষার আস্থাবোধ আনতে হবে। একইভাবে একটি হিংসামুক্ত পরিবেশ গঠন করার মধ্য দিয়েই শিশুদের ইতিবাচক বিকাশ সম্ভব হতে পারে। সরকার চায় ভারতের প্রতিটি মহিলা ও শিশু নির্ভয়ে বাড়ির বাইরে চলাফেরা করুক। সুরক্ষার সরকারি প্রয়াসগুলিও ওই লক্ষ্যকে সামনে রেখে পরিচালিত হচ্ছে।

দীর্ঘ দিন ধরে নারীরা সমাজে বৈষম্য ও অনাচারের শিকার। শিশুদের ক্ষেত্রেও একথা সমানভাবে প্রযোজ্য। দেশের জনসংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশ হলেও এদের গুরুত্ব ও মর্যাদা যথোচিত স্বীকৃতি পায়নি, দেশের উন্নয়ন নিদর্শনগুলিতেও এদের অপাঙক্তেয়তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বলা বাহুল্য এধরনের উন্নয়ন প্রয়াস কখনওই ফলপ্রসূ হতে পারে না। মনে রাখতে হবে মহিলা ও শিশুদের অধিকার রক্ষায় ব্যর্থতার পরিণামে দেশের প্রকৃত অগ্রগতি ব্যাহত হতে পারে। নারী ও শিশুদের এই অবস্থাটা পালটানোর সংকল্প নিয়েই সরকার তার দায়িত্ব পালনে ব্রতী হয়েছে।

নারী ও শিশুদের কল্যাণ ও নিরাপত্তা সুনিশ্চিতকরণ বিষয়ে সরকারের এক সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে। এক্ষেত্রে ক্ষমতায়ন ও সুরক্ষা উভয় দিকই সমান গুরুত্বপূর্ণ এবং এরা পরস্পর সম্পৃক্ত। একটিকে বাদ দিয়ে অন্যটি অর্জন করা সম্ভব নয়। আমি অবশ্য আলোচ্য নিবন্ধের প্রতিপাদ্য হিসাবে নারী ও শিশুদের সুরক্ষাকল্পে সরকার যেসব পদক্ষেপ নিয়েছে সেগুলির উপর বিশেষ জোর দেব।

নিরাপত্তা ও কল্যাণের লক্ষ্যকে সামনে রেখে তাদের জন্য নানা ধরনের প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পগুলির প্রাথমিক উদ্দেশ্য হল একদিকে সমানাধিকারের সুযোগ সৃষ্টি করা, অন্যদিকে তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণের অনুকূল পরিবেশ গড়ে তোলা। এসব প্রকল্প সতত অগ্রসরমান ও পরিবর্তনশীল চাহিদাগুলির প্রতি সংবেদনশীল তথা এগুলির রূপায়ণ বহু ক্ষেত্রে প্রযুক্তির সদ্ব্যবহারের উপর নির্ভরশীল।

পরিবর্তনশীল মানসিকতা

একটি নিরাপদ ও সদর্থক পরিমণ্ডল গড়ে তোলার জন্য একেবারে গোড়ার স্তরে শুরু করতে হবে এবং সমস্যার মূল নিহিত রয়েছে যে মানসিকতায়, তাকেই বিদ্ধ করতে হবে। এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে সরকার দেশের সব কয়টি জেলাকে 'বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও' কর্মসূচির আওতায় এনেছে। সচেতনতার প্রসার, কন্যাভ্রূণ হত্যার উপর কড়া নজরদারি এবং শিশুকন্যাদের উৎসাহ-দানের মধ্যবর্তিতায় এই কর্মসূচিতে সাফল্য এসেছে এবং যেসব জেলায় প্রারম্ভিক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল তার প্রায় অর্ধেকে জন্মকালীন লিঙ্গ অনুপাতে উন্নতি ঘটেছে।

একইভাবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির সাহায্য নিয়ে রূপায়িত হচ্ছে 'Gender Champions' পদক্ষেপটি। এর লক্ষ্য হল পড়ুয়াদের মধ্যে লিঙ্গ বিষয়ক উপলব্ধির বিকাশ ঘটানো, যাতে করে আগামী দিনে তারা নিজেরা নারী ও শিশুদের পক্ষে ক্ষতিকারক কাজকর্ম থেকে বিরত থাকে। লিঙ্গ সচেতনতামূলক এই Gender Champions প্রয়াসটি বর্তমানে দেশের দেড়শো বিশ্ববিদ্যালয় ও ২৩০-টি কলেজে পরিচালিত হচ্ছে।

[লেখক কেন্দ্রীয় নারী ও শিশু বিকাশ মন্ত্রকের সচিব। ই-মেল : secy.wcd@nic.in]

ঘটনার রিপোর্ট করা এবং ভুক্তভোগীদের প্রতি সাহায্য ও সমর্থন জ্ঞাপন

বহু ক্ষেত্রে সরাসরি পুলিশের কাছে যেতে মহিলা ও শিশুদের মধ্যে জড়তা ও দ্বিধা রয়েছে। এই প্রেক্ষিতেই নির্ভয়া তহবিলের আওতায় স্থাপিত হয়েছে ১৮২-টি One Stop Centre (OSC) বা একক জানালা কেন্দ্র। যেসব মহিলারা নিপীড়ন, অত্যাচার ও হিংসার শিকার হয়েছেন, এই কেন্দ্রগুলির মারফত তারা পুলিশি, চিকিৎসা, আইনি ও মনস্তাত্ত্বিক পরিষেবা গ্রহণের সুযোগ নিতে পারবেন এবং প্রয়োজনে কয়েক দিনের জন্য নিরাপদ আশ্রয়েও থাকতে পারবেন। ইতোমধ্যেই ১ লক্ষ ৩০ হাজারের বেশি মহিলার বিভিন্ন ধরনের কেস কেন্দ্রগুলির সাহায্যে মীমাংসিত হয়েছে।

এছাড়া ১৮২ নম্বর মহিলা হেল্প লাইনেও হিংসা ও নিপীড়নের ঘটনা জানানো যেতে পারে। এটি একটি টোল ফ্রি সর্বজনীন নম্বর যার সাহায্যে বিপন্ন মহিলাদের জরুরি বা জরুরি নয় এমন সব কেসের দ্রুত প্রতিকারের চেষ্টা করা হয়ে থাকে। এই নম্বরটিতে ফোনে যোগাযোগ করে মহিলারা জরুরি সাহায্য চাইতে পারেন এবং প্রয়োজনে কাউন্সেলিং নিতে পারেন অথবা আইনি, পুলিশি, মনস্তাত্ত্বিক বা অন্য ধরনের তথ্যাবলী অবগত হতে পারেন। এপর্যন্ত মহিলা হেল্প লাইন চালু হয়েছে ৩০-টি রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত এলাকায় এবং এগুলির দ্বারা উপকৃত হয়েছে ১৬ লক্ষ ৫০ হাজারেরও বেশি অভিযোগকারিণী। আর বিপদগ্রস্ত পরিস্থিতিতে শিশুদের জন্য রয়েছে ১০৯৮ নম্বরের চাইল্ড হেল্প লাইন, যাদের দ্বারা গত বছর সামলানো হয়েছে ১ কোটি ৮০ লক্ষ জরুরি কল।

আর একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ হচ্ছে পুলিশবাহিনীতে মহিলাদের জন্য ৩৩ শতাংশ পদ সংরক্ষণ। এর দ্বারা সংঘটিত অপরাধের ক্ষেত্রে ভুক্তভোগী, বিশেষ করে মহিলা ও শিশুরা পুলিশের কাছে রিপোর্ট করতে উৎসাহিত হবেন বলে আশা করা হচ্ছে। এব্যাপারে একটি নির্দেশিকাও ২২-টি রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত এলাকায় প্রেরিত হয়েছে, যার ফলাফল কী দাঁড়ায় তার প্রতি লক্ষ্য রাখা হচ্ছে। লিঙ্গ সংবেদনশীল কেসগুলির ক্ষেত্রে পুলিশের সার্বিক সক্রিয়তা বাড়াতে এবং পুলিশবাহিনীতে আরও বেশি মহিলাকে নিয়োগ করার লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় নারী ও শিশু বিকাশ মন্ত্রক ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক একজোট হয়ে কাজ শুরু করেছে। এই পদক্ষেপের দ্বারা শূন্য পদগুলি ভরাট করা ছাড়াও পুলিশ সার্ভিসে আরও বেশি সংখ্যাক মহিলার উপস্থিতির গুরুত্ব স্বীকৃতি পাবে এবং পুলিশবাহিনীগুলিও আগের তুলনায় আরও বেশি নারী ও শিশু-বান্ধব হয়ে উঠবে।

> ***"১৮২ নম্বর মহিলা হেল্প লাইনেও হিংসা ও নিপীড়নের ঘটনা জানানো যেতে পারে। এটি একটি টোল ফ্রি সর্বজনীন নম্বর যার সাহায্যে বিপন্ন মহিলাদের জরুরি বা জরুরি নয় এমন সব কেসের দ্রুত প্রতিকারের চেষ্টা করা হয়ে থাকে। এই নম্বরটিতে ফোনে যোগাযোগ করে মহিলারা জরুরি সাহায্য চাইতে পারেন এবং প্রয়োজনে কাউন্সেলিং নিতে পারেন অথবা আইনি, পুলিশি, মনস্তাত্ত্বিক বা অন্য ধরনের তথ্যাবলী অবগত হতে পারেন।"***

শিশুরাও প্রায়ই নিপীড়ন ও অপকর্মের শিকার হয়ে থাকে। এধরনের পীড়াদায়ক ও স্পর্শকাতর অভিজ্ঞতা সম্পর্কে শিশুরা যাতে নিঃসঙ্কোচে ও সহজে রিপোর্ট করতে পারে তার জন্য একটি অনলাইন 'POCSO e-Box' পোর্টাল গঠন করা হয়েছে। এই পোর্টালের সাহায্য নিয়ে কোনও শিশু বা তার হয়ে অন্য কোনও ব্যক্তির পক্ষে ন্যূনতম বিবরণ-সহ অভিযোগ দাখিল করা সম্ভব হবে। অভিযোগ প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে একজন প্রশিক্ষিত কাউন্সেলর শিশুটির সঙ্গে যোগাযোগ করে সহায়তা দেবে এবং প্রয়োজন পড়লে শিশুটির হয়ে একটি আনুষ্ঠানিক অভিযোগ নথিভুক্ত করা হবে।

আইনি কাঠামোকে মজবুত করে তোলা

কেন্দ্রীয় নারী ও শিশু বিকাশ মন্ত্রকের উদ্যোগে সম্প্রতি মানব পাচার (রোধ, সুরক্ষা ও পুনর্বাসন) বিল, ২০১৮-এর খসড়া প্রণীত হয়েছে। উদ্দেশ্য হল মানব পাচারের প্রায়শ গোপন অপরাধের কবল থেকে মহিলা ও শিশুদের রক্ষার্থে আইনি কাঠামোকে শক্তিশালী করা। বর্তমান আইনটিতে যেসব ফাঁকফোকর রয়েছে তা সংশোধন করে আলোচ্য খসড়া বিলে মানব পাচারের সব কয়টি দিককে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। মানব পাচারের মোকাবিলায় একটি শক্তিশালী আইনি, আর্থিক ও সামাজিক আবহ সৃষ্টি করা এবং ভুক্তভোগীদের স্বার্থে জেলা, রাজ্য ও জাতীয় স্তরে 'ডেডিকেটেড' প্রতিষ্ঠান গঠন করার প্রস্তাব এই বিলে রয়েছে।

বাল্যবিবাহের মতো সামাজিক কুপ্রথার কবল থেকে শিশুদের বাঁচানোর আইনি কাঠামোকেও শক্তিশালী করে সেটিকে বলবৎ করা হচ্ছে। ২০০৬-এর বাল্যবিবাহ নিষিদ্ধকরণ আইনেই যারা বাল্যবিবাহের প্রসার, অনুসরণ ও মদত দিচ্ছে, তাদের সাজা দেবার সংস্থান আছে। আইনটির সুষ্ঠু বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের পক্ষ থেকে রাজ্য সরকারগুলির সঙ্গে সমন্বয় স্থাপন করা হচ্ছে এবং প্রয়োজনে সরাসরি জেলা শাসকদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হচ্ছে। কেন্দ্রীয় নারী ও শিশু বিকাশ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে আরও প্রস্তাব করা হয়েছে যে কুপ্রথাটির প্রতিরোধক হিসাবে সংশ্লিষ্ট আইনে সংশোধনী এনে এবার থেকে বাল্যবিবাহকে সর্বতোভাবে অসিদ্ধ করা হোক।

কর্মস্থলে নারীদের যৌন হেনস্থা (প্রতিরোধ, নিষিদ্ধকরণ ও প্রতিকার) আইন, ২০১৩ ঠিকমতো বলবৎ হচ্ছে কিনা তার উপর কেন্দ্রীয় নারী ও শিশু বিকাশ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে তীক্ষ্ণ নজরদারি চালানো হচ্ছে। এই আইনটি বিষয়ে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি ও শিবির পরিচালনার জন্য ১১২-টি প্রতিষ্ঠানকে প্যানেলভুক্ত করা হয়েছে। এছাড়া টেলিভিসন, বেতার ও অনলাইনে এনিয়ে ব্যাপক প্রচার

অভিযানও শুরু হয়েছে। কর্মস্থলে মহিলাদের যৌন হয়রানি সংক্রান্ত অভিযোগগুলি গ্রহণ করার জন্য সহজে ব্যবহারযোগ্য অনলাইন পোর্টাল 'SHe-Box' চালু হয়েছে। পদমর্যাদা ও সংস্থা নির্বিশেষে মহিলারা সেখানে অভিযোগ দাখিল করতে পারবেন। বলা বাহুল্য যে, কর্মস্থল নিরাপদ হয়ে উঠলে আগামী দিনে আরও বেশি সংখ্যক মহিলা কাজে যোগদান করতে উৎসাহিত হবেন।

ঘরে বা বাইরে যেখানেই হোক না কেন মহিলাদের সুরক্ষা দেবার বিষয়টি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রকে এখন যথেষ্ট গুরুত্ব পাচ্ছে। সারা দেশে গার্হস্থ্য হিংসা থেকে মহিলাদের রক্ষা করার জন্য ২০০৫ সালের PWDVA বলবৎ রয়েছে; যে আইনের আওতায় মহিলাদের বিভিন্ন কেসের সুরাহা করা হচ্ছে। যৌতুকের মতো সামাজিক কুপ্রথার সমাধানকল্পে জোর কদমে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে যৌতুক নিষিদ্ধকরণ আইনের আওতায়। আইনটিতে যৌতুককে বিশদভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে এবং পণ দেওয়া-নেওয়া বা তাতে প্ররোচনা দেবার ক্ষেত্রে শাস্তিদানের সংস্থান রয়েছে।

প্রচার অভিযানের সাহায্যে ওইসব আইনের তাৎপর্য গণমাধ্যমে তুলে ধরার একটি কর্মসূচি প্রণীত হয়েছে এবং ইতোমধ্যেই টেলিভিসন, বেতার ও অন-লাইন মাধ্যমগুলি একাজে নেমে পড়েছে।

ট্যাক্সিযাত্রী হিসাবে মহিলাদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার নতুন নির্দেশিকা জারি হয়েছে; যার বিশেষত্ব হল প্রতিটি ট্যাক্সিতে বাধ্যতামূলকভাবে GPS প্যানিক ব্যবস্থা চালু করা, চালকের সচিত্র পরিচয়পত্র ও গাড়ির রেজিস্ট্রেশন নম্বরকে পরিষ্কারভাবে ডিসপ্লে করা, মহিলা যাত্রীদের অনুমতিসাপেক্ষে অন্যদের সঙ্গে সিট ভাগাভাগি করা ইত্যাদি। মহিলা ও শিশুদের ট্যাক্সিযাত্রাকে নিরাপদ করে তোলাই এসব ব্যবস্থার একমাত্র উদ্দেশ্য।

উদ্ভাবনমূলক প্রকল্পের জন্য তহবিল সংস্থান

প্রায়ই বলা হয়ে থাকে যে, নির্ভয়া তহবিলের টাকা ঠিকমতো সদ্ব্যবহার করা হচ্ছে না। অথচ বাস্তব ঘটনা হল এই তহবিলের অন্তর্গত প্রায় ৬২২৩.৭৯ কোটি টাকার উদ্ভাবনমূলক একাধিক প্রকল্প ইতোমধ্যেই নির্ধারিত হয়েছে।

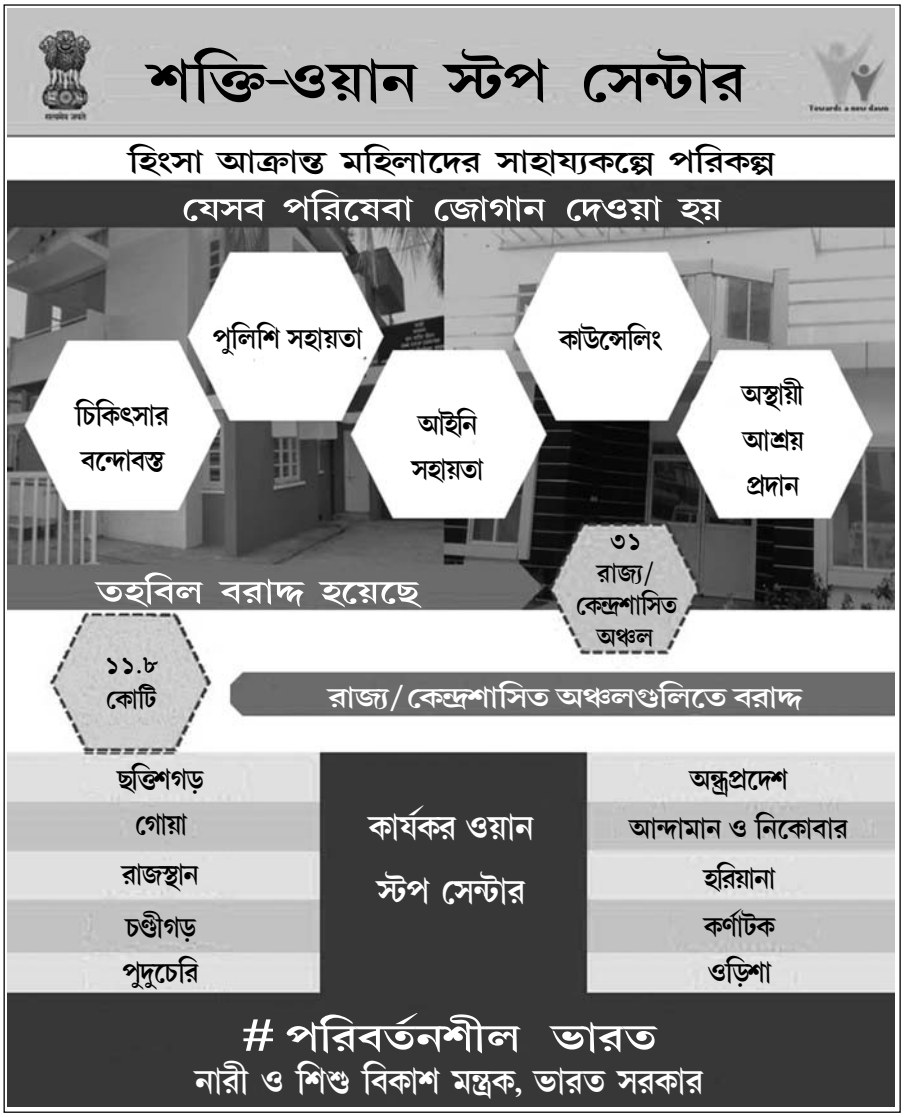

বিপদগ্রস্ত মহিলাদের জরুরি ভিত্তিতে সহায়তা দেবার জন্য দেশের প্রতিটি মোবাইল ফোনে শীঘ্রই একটি 'প্যানিক বাটন' সংযোজিত হবে। এই প্যানিক বাটনের সাহায্যে নিকটতম পুলিশ কন্ট্রোল রুম ও নির্বাচিত বন্ধু বা আত্মীয়স্বজনদের কাছে জরুরি সংকেত পৌঁছবে; যা কিনা উপগ্রহভিত্তিক GPS-এর সাহায্যে ওই মহিলা কোথায় রয়েছেন তা-ও জানাবে। ব্যবস্থাটির প্রথম পর্যায়ের পরীক্ষা-নিরীক্ষা ইতোমধ্যেই উত্তরপ্রদেশে সুসম্পন্ন হয়েছে এবং শীঘ্রই সারা দেশে এর উপযোগিতা যাচাই করা হবে।

নির্ভয়া তহবিলের আর একটি উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টায় দেশের আটটি বড়ো শহরকে মহিলাদের চলাচলের জন্য সুরক্ষিত করার লক্ষ্যে একটি সুসংবদ্ধ পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। এগুলির মধ্যে রয়েছে পথঘাট আলোকিতকরণ, নিরাপদ গণ পরিবহণ ও উন্নতমানের পুলিশি ব্যবস্থা। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট শহরগুলি অন্যান্যদের কাছে অনুকরণযোগ্য হয়ে উঠবে। নির্ভয়া তহবিলেরই আওতায় বিভিন্ন পরীক্ষাগারের ফোরেনসিক কাজকর্মকে ঢেলে সাজানো হচ্ছে। এর দরুন ধর্ষণ ও যৌন আক্রমণজনিত কেসগুলিতে মামলা সাজানোর কাজে উন্নতি ও দ্রুততা আসবে।

সুরক্ষায় তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার

একদিকে যেমন প্রযুক্তির অভাবনীয় উন্নতি ঘটেছে, অন্যদিকে তেমনই ডিজিটাল প্রকরণকে অবলম্বন করে নারী ও শিশুদের উপর হিংসা ও অনাচারের প্রবণতা উত্তরোত্তর

বৃদ্ধি পেয়েছে। পরিস্থিতির মোকাবিলায় সরকার চালু কাঠামোগুলিতে পরিবর্তন আনতে বাধ্য হয়েছে। স্থাপিত হয়েছে একটি কেন্দ্রীয় রিপোর্টিং ব্যবস্থা; যেটি সাইবার অপরাধ রিপোর্ট করার ক্ষেত্রে সকলকে একটি হট লাইনের সুবিধা দেবে। ডিজিটাল মাধ্যম থেকে শিশু পর্নোগ্রাফি, ধর্ষণ, গণধর্ষণের অশ্লীল ছবি মুছে ফেলার আরও সহজ প্রযুক্তি চালু হতে চলেছে। বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ ও সকল স্তরের জনসাধারণকে আরও সজাগ ও সচেতন করে তুলে সাইবার অপরাধ প্রতিরোধ করার প্রয়াসও হাতে নেওয়া হয়েছে।

তথ্যপ্রযুক্তিকে হাতিয়ার করে শিশুদের আরও বেশি সুরক্ষিত করার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের উদ্যোগে ইতোমধ্যেই নাগরিক-নির্ভর 'খোয়া পায়া' নামক এক অনলাইন পোর্টাল চালু হয়েছে। এতে রয়েছে হারিয়ে যাওয়া ও খুঁজে পাওয়া শিশুদের বিষয়ে বিভিন্ন তথ্য; যাতে করে তাদের চিহ্নিত করে পরিবারে ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয়। ২০১৫ সাল থেকে শুরু হয়ে এই পোর্টালে আজ অবধি দুই হাজারের বেশি নিরুদ্দেশ হওয়া অথবা খুঁজে পাওয়া শিশুদের কেস উল্লিখিত হয়েছে। শিশু-বান্ধব এসব পদক্ষেপ সম্পর্কে যাবতীয় তথ্যাবলী NCERT পাঠ্যক্রমের বইগুলির সামনের প্রচ্ছদে ছাপা হচ্ছে, যাতে করে এসব নিয়ে শিশুমনে সর্বোচ্চ সচেতনতার বিকাশ ঘটে।

নিপীড়িতদের পুনর্বাসন

সুসংবদ্ধ সরকারি প্রয়াসগুলির অন্যতম হল, যারা যৌন হেনস্থার শিকার হয়েছেন তাদের পুনর্বাসন দেবার ব্যবস্থা করা। এক্ষেত্রে ভুক্তভোগীদের দেবার জন্য নির্ভয়ার অন্তর্গত কেন্দ্রীয় ক্ষতিপূরণ তহবিল থেকে রাজ্য সরকারগুলিকে অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দ করা হয়ে থাকে। এরপর রয়েছে দীর্ঘস্থায়ী ক্ষতিগ্রস্তদের বিশেষ করে অ্যাসিড আক্রান্তদের চিকিৎসার বিষয়টি। এক্ষেত্রে অ্যাসিড আক্রমণজনিত ক্ষতি বা দৈহিক বিকৃতির কেসগুলিকে সুনির্দিষ্ট প্রতিবন্ধকতার তালিকাভুক্ত করার জন্য কেন্দ্রীয় নারী ও শিশু বিকাশ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় সামাজিক ন্যায়বিচার ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রকের কাছে অনুরোধ জানানো হয়েছে। সম্প্রতি প্রণীত প্রতিবন্ধী আইন, ২০১৬-তে অ্যাসিড আক্রমণকে পঙ্গুতার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যার ফলে আক্রান্তরা এখন থেকে প্রতিবন্ধী মানুষদের জন্য চিহ্নিত কল্যাণমূলক প্রয়াসগুলির সুযোগ নিতে পারবেন।

আর একটি উদ্ভাবনমূলক পদক্ষেপ হিসাবে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রকের উদ্যোগে দেশের ৬০-টি গুরুত্বপূর্ণ রেল স্টেশনে 'শিশু সহায়তা' ডেস্ক খোলা হয়েছে। সাধারণত রেল স্টেশনগুলিই শিশু পাচারের অন্যতম গন্তব্যস্থল হয়ে থাকে। সহায়তা ডেস্কগুলির মধ্যবর্তিতায় দুর্বিপাকগ্রস্ত শিশুদের চিহ্নিতকরণ, উদ্ধার, বাড়িতে ফেরত আনা ও পুনর্বাসনের কাজে অগ্রগতি ঘটবে।

বিভিন্ন পদক্ষেপের সম্পূর্ণতা

সরকারি সুরক্ষা ব্যবস্থা গ্রামের মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে সম্প্রতি মহিলা শক্তি কেন্দ্র কর্মসূচি শুরু হয়েছে. এর সাহায্যে গ্রামের মহিলাদের কাছে তাদের দোরগোড়ায় সাহায্য-পরিষেবা পৌঁছে দেবার কাজে ১২৫-টি অত্যন্ত পিছিয়ে পড়া জেলায় প্রায় ৩ লক্ষ ছাত্র স্বেচ্ছাসেবী নিয়োজিত রয়েছেন। সরকারের অন্যান্য কল্যাণমূলক প্রয়াসের মধ্যে আর একটি হল, যেসব মহিলা হিংসা ও নিপীড়নের শিকার হয়েছেন তাদের কাছে ছাত্ররা যাবেন এবং প্রতিকারের জন্য যেসব সরকারি ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা রয়েছে সেবিষয়ে মহিলাদের শিক্ষিত ও সচেতন করবেন।

ভারতীয় নারীদের যদি জনজীবনে সর্বাত্মক অংশগ্রহণ করে অর্থনৈতিক বিকাশে অবদান রাখতে হয় তাহলে সবার আগে তাদের মধ্যে নিরাপত্তা ও সুরক্ষার আস্থাবোধ আনতে হবে। একইভাবে একটি হিংসামুক্ত পরিবেশ গঠন করার মধ্য দিয়েই শিশুদের ইতিবাচক বিকাশ সম্ভব হতে পারে। সরকার চায় ভারতের প্রতিটি মহিলা ও শিশু নির্ভয়ে বাড়ির বাইরে চলাফেরা করুক। সুরক্ষার সরকারি প্রয়াসগুলিও ওই লক্ষ্যকে সামনে রেখে পরিচালিত হচ্ছে।❑

আগামী সংখ্যার প্রচ্ছদ নিবন্ধ

নয়া ভারতের চিত্র

এছাড়াও থাকছে বিশেষ নিবন্ধ ও অন্যান্য নিয়মিত বিভাগসমূহ

যোজনা (বাংলা)-এ প্রকাশিত নিবন্ধ ও অন্যান্য নিয়মিত বিভাগে প্রকাশিত বিষয়বস্তু পাঠকদের কেমন লাগছে সে সম্পর্কে মতামত জানতে আগ্রহী আমরা। ই-মেল মারফত অথবা আমাদের দপ্তরে চিঠি লিখে পাঠকরা তাদের মতামত তথা আগামী দিনে আর কী ধরনের লেখাপত্র এই পত্রিকায় দেখতে চান তা জানাতে পারেন।

ভারতীয় অর্থনীতি : প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগের ভূমিকা

ড. তৃপ্তেন্দু প্রকাশ ঘোষ

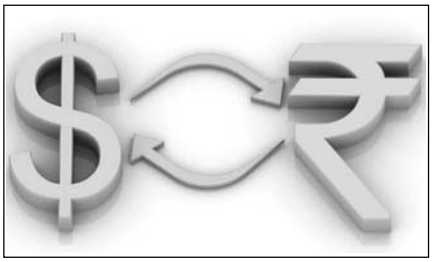

*১৯৮০-র দশক থেকে শুরু করে প্রায় তিন দশক ধরে (প্রায় ২০১০ অবধি) চিন অর্থনৈতিক বৃদ্ধির একটা বিরাট হার (বার্ষিক প্রায় ১০ শতাংশ) বজায় রেখেছে। দেশটি বছরের পর বছর ধরে বিশাল পরিমাণে অন্তর্মুখী **FDI** পেয়ে এসেছে। চিনে অর্থনৈতিক সংস্কার শুরু হয় ১৯৭০-র দশকের শেষ ভাগে। আর ভারতে তা শুরু হয় ১৯৯১-এ। প্রায়শই বলা হয়ে থাকে যে গত দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে মোট পরিমাণ এবং আপেক্ষিক হিসেবের নিরিখে চিন ভারতের থেকে অনেক বেশি **FDI** পেয়ে এসেছে। অর্থাৎ, ভারতের ক্ষেত্রে **FDI** প্রাপ্তির হার নগণ্য। কথাটা খুব একটা ভুল নয়।*

দেশের কোনও ব্যবসায়িক সংগঠনে অন্য কোনও দেশের ব্যবসায়িক সংগঠনের বা ব্যক্তির বিনিয়োগকে প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ (Foreign Direct Investment, বা FDI) বলা হয়। এক্ষেত্রে প্রথম দেশটিকে বলা হয় আশ্রয়দানকারী বা গ্রাহক দেশ (host country) এবং দ্বিতীয় দেশটিকে বলা হয় উৎস দেশ (Source বা origin country)। আশ্রয়দানকারী দেশের ক্ষেত্রে এই প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ হল অন্তর্মুখী (Inward FDI), আর উৎস দেশের কাছে তা হল বহির্মুখী বিনিয়োগ (Outward FDI)।

উন্নত, উন্নয়নশীল এবং অনুন্নত, সবরকম দেশই তাদের অর্থনীতিতে অন্তর্মুখী প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগে উৎসাহ দিয়ে থাকে বিভিন্ন কারণে। প্রথমত, FDI দেশের বিনিয়োগ বাড়ায়। যেকোনও দেশের মোট বিনিয়োগের মূলধন জোগায় প্রধানত সেই দেশের মোট অভ্যন্তরীণ সঞ্চয়। FDI-এর জন্য মোট অভ্যন্তরীণ বিনিয়োগ হার মোট অভ্যন্তরীণ সঞ্চয়ের হারের থেকে ছাড়িয়ে যেতে পারে। আর এই অতিরিক্ত বিনিয়োগের ফলে তৈরি হয় অতিরিক্ত কর্মসংস্থান, জাতীয় উৎপাদন এবং করযোগ্য আয়। দ্বিতীয়ত, FDI কখনও কখনও নিয়ে আসে নতুন প্রযুক্তি বা পেশ করে সম্পূর্ণ নতুন ধরনের পণ্য বা পরিষেবা। এই সুবিধাটি অনুন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশগুলির কাছে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। তৃতীয়ত, (অন্তর্মুখী) FDI অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সঙ্গে করে নিয়ে আসে ব্যবসা পরিচালনা সম্পর্কিত নতুন দক্ষতা (New Managerial Skill) এবং এই সুবিধাটিও গ্রাহক উন্নয়নশীল দেশগুলির কাছে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। উপরোক্ত দ্বিতীয় এবং তৃতীয় সুবিধাগুলিকে অনেক সময় "spill-over effect" বলা হয়ে থাকে। চতুর্থত, (অন্তর্মুখী) FDI নিয়ে আসে বিদেশি মুদ্রা, আর এই সুবিধাটির গুরুত্ব সেই দেশগুলির কাছে অপরিসীম, যেগুলি কাঠামোগত কারণে বহির্বাণিজ্যের চালু খাতায় (current account) ক্রমিক ঘাটতি (chronic deficit)-তে ভোগে। এই দলে সেই দেশগুলি পড়বে যাদের তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাসের ভাণ্ডার প্রয়োজনের তুলনায় কম, বা একেবারেই নেই।

FDI-এর উপরোক্ত সুবিধাগুলি সবই গ্রাহক দেশগুলির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। উৎস দেশগুলির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এমন অন্তত দু'টি সুবিধার কথা এখানে বলা যেতে পারে। প্রথমত, বহির্মুখী বা Outword FDI উৎস দেশগুলিতে অভ্যন্তরীণ বিনিয়োগের মূলধন জোগানোর পরেও যে অতিরিক্ত অভ্যন্তরীণ সঞ্চয় থেকে যায়, তাকে লাভজনকভাবে বিনিয়োগ করার পথ করে দেয়। সঞ্চিত অতিরিক্ত পুঁজির ভারে জর্জরিত উন্নত দেশগুলির সামনে এ এক গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ। আমেরিকা, ইংল্যান্ড ও জাপানের মতো উন্নত দেশগুলি যে বিশ্বব্যাপী বহির্মুখী FDI-এর এক বিশাল উৎস সেই তথ্যটি এর

[লেখক সহকারী অধ্যাপক, JIFT Kolkata Campus। ই-মেল : tpghosh@gmail.com]

জাজ্বল্যমান প্রমাণ। তবে একবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের শেষভাগে দাঁড়িয়ে এটাও বলা যায় যে, অন্তত কয়েকটি উন্নয়নশীল দেশ বহির্মুখী FDI-এর সুবিধা নিতে পেরেছে (যেমন, চিন এবং ভারত)। এটি হল বহির্মুখী FDI-এর দ্বিতীয় সুবিধা। উন্নয়নশীল দেশগুলির কয়েকটি বড়ো বড়ো আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ী সংগঠন উন্নত দেশের অর্থনৈতিক (economic) বা আর্থিক (financial) সংকটের সুযোগ নিয়ে সেই (উন্নত) দেশগুলির কিছু বড়ো ব্যবসায়িক সংস্থাকে কিনে নিয়েছে। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যায় টেটলি টি (Tetley Tea), জাগুয়ার ল্যান্ডরোভার (Jaguar Land Rover), কোরাস স্টিল (Chorus Steel) ইত্যাদি ইউরোপীয় সংস্থাগুলিকে ভারতের টাটা গ্রুপ অধিগ্রহণ করেছে। একই নিঃশ্বাসে বলা যায় লেনোভো-র কথা, যাকে একটি চৈনিক ব্যবসায়ী সংস্থা অধিগ্রহণ করেছে বেশ কয়েক বছর আগে। এই ধরনের অধিগ্রহণে উন্নয়নশীল দেশের বহুজাতিক ব্যবসায়ী সংস্থাগুলি উন্নত দেশের প্রযুক্তি, বাজার এবং ব্র্যান্ডের মালিকানা পেয়ে যায় লপ্তে।

FDI-এর সংজ্ঞা (Definition)—UNCTAD

UNCTAD-এর Balance of Payments Manual, 5th Edition (Washington D.C., 1993) অনুসারে FDI হল সেই বিনিয়োগে যা একজন বিনিয়োগকারী করে, যার উদ্দেশ্য হল দেশের বাইরের কোনও ব্যবসাতে দীর্ঘস্থায়ী স্বার্থ (যথা, মালিকানা) অর্জন করা "...to acquire lasting interest in enterprises operating outside of the economy of the investor.")। এই ধরনের বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বিনিয়োগকারী অধিকাংশ সময়েই অন্তত আংশিক মালিকানা অর্জন করার চেষ্টা করেন। যাতে ওই ব্যবসার পরিচালনাতে বিনিয়োগকারীর অংশগ্রহণ সম্ভব হয়। এই ধরনের বিনিয়োগে (অর্থাৎ, FDI-তে) বিনিয়োগকারীর পুঁজির অবদান (capital contribution) বিভিন্ন রকম হতে পারে : আংশিক বা সম্পূর্ণ মালিকানা (partial or

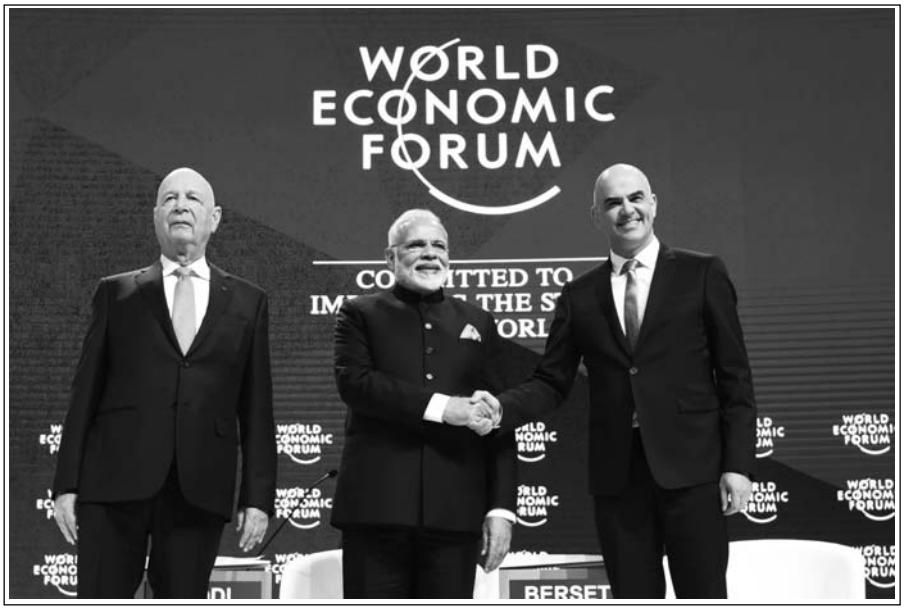

complete equity ownership), পুনরায় বিনিয়োগকৃত লভ্যাংশ (re-invested earnings), বিনিয়োগকারী দ্বারা বিনিয়োগকৃত ব্যবসাকে দেওয়া দীর্ঘমেয়াদি ও স্বল্পমেয়াদি ঋণ (long term and short term intra-corporate loans) ইত্যাদি। তবে UNCTAD থেকে বা অন্যান্য সূত্র থেকে পাওয়া FDI-এর পরিসংখ্যান নিয়ে কাজ করার সময় এটা মনে রাখা প্রয়োজন যে কিছু কিছু দেশের ক্ষেত্রে intra-corporate loan-এর ব্যাপারে পরিসংখ্যান পাওয়া যায় না, এবং তা অন্তর্মুখী এবং বহির্মুখী দুই ধরনের FDI-এর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

FDI বিষয়ক ভারতীয় নীতি

স্বাধীনতার পরে ভারতবর্ষ পরিকল্পিত অর্থনৈতিক উন্নয়ন (planed economic development)-এর পথ গ্রহণ করে; যাতে সরকারি মালিকানাধীন ব্যবসায়িক সংস্থাগুলির ওপর বিশেষভাবে জোর দেওয়া হয় এবং নির্ভর করার কথা ভাবা হয়। একই সঙ্গে আমদানি প্রতিস্থাপন করার শিল্পায়ন কৌশল (import substituting industrialization strategy)-ও গ্রহণ করা হয়। যদিও এই সময়ে আমাদের দেশে FDI-এর বিরুদ্ধে স্পষ্টভাবে বিবৃত কোনও নীতি ছিল না, আবার FDI উৎসাহিত করার মতো কোনও নীতিও ছিল না। উনিশশো পঞ্চাশের দশকে কয়েকটি ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায়। যথা, ১৯৫৬ সালে ইম্পেরিয়াল ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়াকে ভারত সরকার অধিগ্রহণ করে (ইউরোপীয়ান এবং অন্যান্য ব্যক্তিগত অংশীদারদের থেকে) এবং স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া স্থাপন করে। শত শত বড়ো ও ছোটো ব্যক্তিগত মালিকানাধীন জীবন বিমা সংস্থা অধিগ্রহণ করে সম্পূর্ণ সরকারি মালিকানাধীন Life Insurance Corporation (LIC) স্থাপন করে। এছাড়াও, Companies Act, 1956 প্রণয়ন করে, Securities Control and Regulation Act (SCRA), 1956 প্রণয়ন করে; যেগুলি প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগের ওপর (এবং যেকোনও দেশি বা বিদেশি ব্যবসার ওপর) আইনি আগল প্রবর্তন করে।

যাই হোক, প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এই ধরনের কিছু পরীক্ষামূলক এবং অপরিকল্পিত পদক্ষেপের পরে ১৯৭৩ সালে ভারতবর্ষ প্রথম Foreign Exchange Regulation Act, 1973 (FERA, 1973) আইনটি প্রণয়ন করে, যা নিশ্চিতভাবে বিদেশি বিনিয়োগের বিরোধিতা করা শুরু করে। এই আইনের ফলে ১৯৭০-এর দশকে বেশ কয়েকটি বিদেশি সংস্থা ভারত ছেড়ে চলে যায় (যেমন, IBM, Coca Cola), এবং কয়েকটি সংস্থা ভারতের শেয়ার বাজারে শেয়ার ছেড়ে বিদেশি মালিকানা চল্লিশ শতাংশ বা তার কমে নামিয়ে আনে (যেমন, ITC)।

১৯৯১ সালে অর্থনৈতিক সংস্কার (economic reforms) চালু করার পরে ধীরে ধীরে প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ সম্পর্কে সরকারি নীতি সংশোধিত হতে শুরু করে। প্রথম পর্যায়ে বিশেষ কয়েকটি শিল্পক্ষেত্র বেছে নিয়ে সেগুলিতে বিদেশি মালিকানার ঊর্দ্ধতম সীমা নির্দেশ করা হয় (২৬ শতাংশ, ৪৯ শতাংশ, ৭৪ শতাংশ, ১০০ শতাংশ ইত্যাদি)। ১৯৯৯ সালে FERA আইনটি রদ করে Foreign Exchange Management Act বা FEMA প্রবর্তন করা হয়। এর আগে প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগের প্রস্তাবগুলি অনুমোদন দেওয়ার জন্য একটা দ্বি-স্তরীয় ব্যবস্থা তৈরি করা হয় (১৯৯২ সালে)। যে প্রস্তাবগুলি নীতি নির্ধারিত শিল্পের ক্ষেত্রে বিদেশি মালিকানার সীমার মধ্যে, সেগুলিকে তৎক্ষণাৎ বা RBI পথে (Automatic or RBI route) বিচার করা হ'ত। এই ক্ষেত্রে RBI-কে শুধু তথ্য দিতে হ'ত। যে প্রস্তাবগুলি এর বাইরে থাকত সেগুলির জন্য Foreign Investment Promotion Board (FIPB) সিদ্ধান্ত নিত। FIPB ছিল প্রধানত, কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রকের সমন্বয় সভা, যেখানে মন্ত্রকগুলির মতামত জেনে বিদেশি বিনিয়োগের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া হ'ত। FIPB-র সভাপতি (Chairman) হতেন অর্থনৈতিক বিষয়ক সচিব (Economic Affairs Secretary), আর স্থায়ী সদস্যরা হতেন Department of Industrial Policy and Promotion (DIPP)-র সচিব, বাণিজ্য সচিব, বিদেশ দপ্তরের অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিষয়ক সচিব (Economic Relations Secretary)। এছাড়া ক্ষুদ্র, মাঝারি এবং অতিক্ষুদ্র ব্যবসা (small, medium and micro enterprise) দপ্তরের সচিব এবং রাজস্ব সচিবকেও FIPB-তে অন্তর্ভুক্ত করা হ'ত।

কিন্তু FDI অনুমোদন পদ্ধতিতে সরলীকরণের জন্য ২০১৭-র মে মাসে FIPB অবলুপ্ত করা হয়। তার বদলে এখন DIPP কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করে, যাতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রক (Ministry) DIPP-র সঙ্গে আলোচনা করে FDI প্রস্তাব-এর ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়। DIPP ইতোমধ্যে FIPB-র ওয়েব পোর্টালটির নাম পরিবর্তন করেছে এবং নতুন নামটি হল Foreign Investment Facilitation Portal (FIFP)। FDI নীতির অন্যান্য খুঁটিনাটি বিষয়গুলি DIPP-র ওয়েবসাইট থেকে দেখা যেতে পারে।

এর (অর্থাৎ, মে ২০১৭) আগে ২০১৪-'১৫ আর্থিক বছরে FDI নীতি বিষয়ক আর একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন করা হয়। এই পরিবর্তনের সূচনা হয় ২০১৩-'১৪-এর কেন্দ্রীয় বাজেটে অর্থমন্ত্রীর এক ঘোষণার মাধ্যমে। অর্থমন্ত্রী সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে আন্তর্জাতিক রীতি অনুসরণ করে ভারতেও বিদেশি বিনিয়োগে মালিকানার ঊর্ধ্বসীমা FDI-এর ক্ষেত্রে এবং অপ্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ (Foreign Portfolio Investment বা, FPI, যা প্রধানত শেয়ার বাজারে নথিভুক্ত কোম্পানির শেয়ার কেনার মাধ্যমে ঘটে)-র ক্ষেত্রে আলাদাভাবে প্রযোজ্য হবে না। অর্থাৎ, FDI নীতিতে নির্দিষ্টকৃত মালিকানার ঊর্ধ্বসীমা সমানভাবে প্রযোজ্য হবে FDI এবং FPI উভয় ক্ষেত্রেই।

এর ফলস্বরূপ মার্চ, ২০১৩-এ তৎকালীন অর্থনৈতিক বিষয়ক দপ্তরের সচিব (Secretary, Dept. of Economic Affairs) ডক্টর অরবিন্দ মায়ারামের নেতৃত্বে একটি কমিটি তৈরি করা হয়। এই কমিটির রিপোর্ট জমা পড়ে জুন, ২০১৪-এ। সরকার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সেই রিপোর্ট গ্রহণ করে এবং সুপারিশগুলি মানা হয়, তথা FDI ও FPI-র সংজ্ঞাও পরিবর্তন করা হয়।

RBI (2018) অনুসারে, সেই সময় থেকে FDI-এর সংজ্ঞা হল :

"investment through capital instruments by a person resident outside India (a) in an unlisted Indian company; or (b) in 10 per cent or more of the post-issue paid-up equity capital on a fully diluted basis of a listed Indian company."

এর অর্থ হল, শেয়ার বাজারে নথিভুক্ত নয় এই রকম কোনও ভারতীয় ব্যবসাতে যেকোনও পরিমাণ (১ শতাংশ থেকে ১০০ শতাংশ) বিদেশি বিনিয়োগ FDI বলে ধরা হবে) কিন্তু ভারতীয় ব্যবসাটি যদি শেয়ার বাজারে নথিভুক্ত হয়, তাহলে FDI আখ্যা পেতে গেলে কমপক্ষে ১০ শতাংশ বিদেশি বিনিয়োগ প্রয়োজন।

এছাড়া, মায়ারাম কমিটির সুপারিশ মেনে শেয়ার বাজার নিয়ামক SEBI-ও FPI-এর সংজ্ঞা পরিবর্তন করেছে। FPI-দের (২০১৪-র আগে এদের Foreign Institutional Investor বা FII বলা হ'ত) ভারতে বিনিয়োগ করার আগে SEBI-তে নিবন্ধভুক্ত (Registered) হতে হয়। ২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮ তারিখ পর্যন্ত ৯০৮৩-টি সংস্থা SEBI-তে FPI হিসেবে নিবন্ধভুক্ত (Registered) আছে। বর্তমানে কোনও একটি FPI যদি কোনও একটি কোম্পানিতে ১০ শতাংশের কম মালিকানা নিয়ে থাকে, তাহলে সেটিকে FDI ধরা হবে না। এর অর্থ হল যে যদি কোনও একটি FPI কোনও একটি কোম্পানিতে ১০ শতাংশ বা তার বেশি মালিকানা নিয়ে ফেলে, তবেই এটি FDI হিসেবে গণ্য হবে।

ভারতে অন্তর্মুখী (Inward) FDI-এর নির্ধারক

যদিও উন্নত দেশের তুলনায় উন্নয়নশীল দেশে অন্তর্মুখী FDI-এর নির্ধারকগুলি কিছুটা আলাদা, তবুও কয়েকটি নির্ধারক উভয় ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। অন্তর্মুখী FDI-এর সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ নির্ধারকের মধ্যে অন্যতম হল অভ্যন্তরীণ বাজারের আয়তন এবং তার বৃদ্ধির হার, শ্রমের খরচ বা মজুরী হল আর একটা গুরুত্বপূর্ণ নির্ধারক, বিশেষ করে শ্রম-নিবিড় (labour-intensive) শিল্পগুলির ক্ষেত্রে। অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ নির্ধারক হল : অর্থনীতিটি আন্তর্জাতিকভাবে কতটা উন্মুক্ত (degree of openness), ব্যবসায়িক লাভের ওপর করের হার (Corporate Tax Rate), FDI নীতি ও তার কাঠামো ইত্যাদি।

অন্তত ১৯৬০-এর দশক থেকেই প্রচলিত মতানুসারে, FDI-কে রপ্তানির বিকল্প হিসেবে দেখা হ'ত। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় : ভারতের বাজার ধরার জন্য Apple Inc. ভারতের বাইরের কোনও দেশের কারখানায় আই ফোন বা ট্যাব উৎপাদন করে ভারতে

রেখাচিত্র-১
ভারতে প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগের প্রবাহ

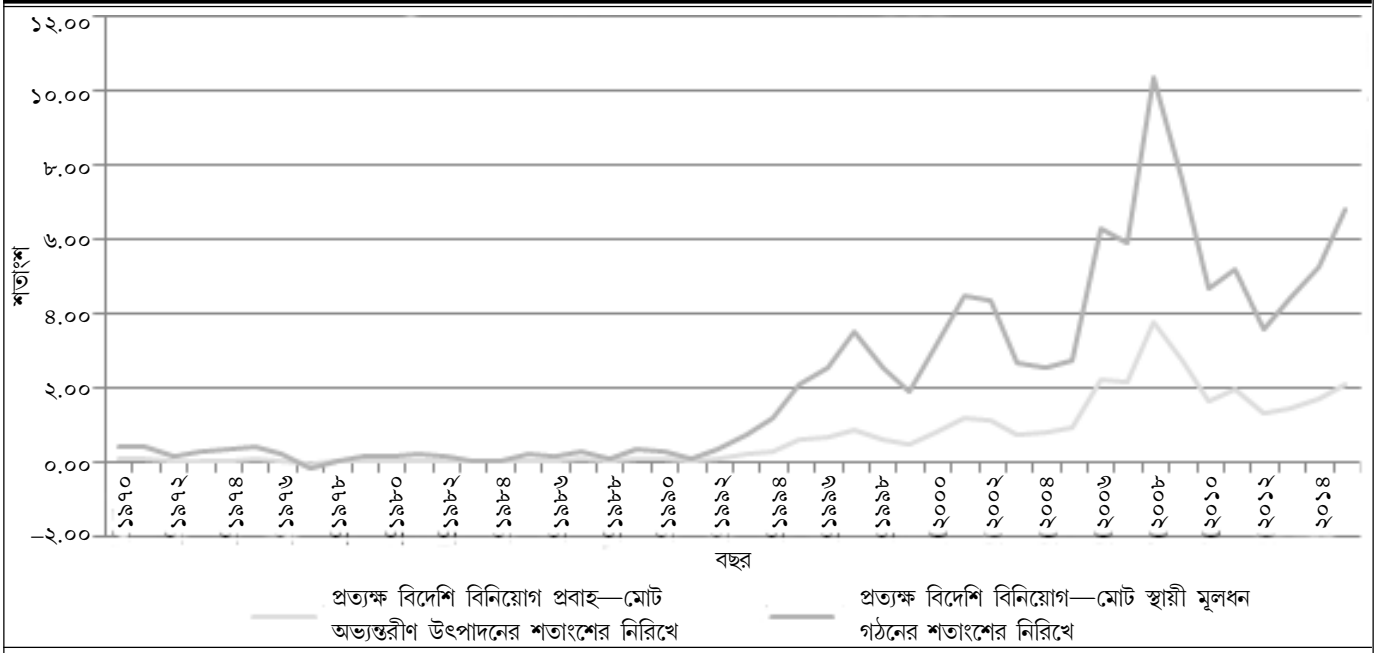

সূত্র : FDI তথ্যভাণ্ডার, UNCTAD

রপ্তানি করতে পারে। অন্যথায় Apple Inc. ভারতে FDI-এর মাধ্যমে কারখানা তৈরি করে সেখানেই আই ফোন বা ট্যাব উৎপাদন করতে পারে। অর্থনৈতিক সংস্কার শুরু হওয়ার পরে (অর্থাৎ, ১৯৯০-এর দশকে) ভারতবর্ষে (এবং তার কিছুকাল আগে থেকেই উন্নত দেশগুলিতে) এই মতের পরিবর্তন ঘটে, যখন এটা প্রমাণিত হয়ে যায় যে, বৈদেশিক বাণিজ্য (রপ্তানি এবং আমদানি) ও FDI পরস্পর সম্পর্কযুক্ত—একে অন্যকে বাড়তে সাহায্য করে। কোনও একটি পণ্যে বাণিজ্য যথেষ্ট পরিমাণে বাড়ার পর, এবং অন্যান্য পরিস্থিতি অনুকূল হলে FDI আসে। আর FDI-এর পরে রপ্তানি ও আমদানি উভয়ই বাড়ে—কাঁচামাল বা অন্তর্বর্তী কাঁচামাল (intermediate input) বা ভোগ্যপণ্যে ; যা আদতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বহুজাতিক কোম্পানির বিভিন্ন দেশের ব্যবসার মধ্যে আদানপ্রদান।

মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (Free Trade Agreement), পক্ষপাতমূলক বাণিজ্য চুক্তি (Preferential Trade Agreement), বিনিয়োগ ও পরিষেবা চুক্তি (Agreement in Services and Investment) ইত্যাদি থাকলেও FDI বৃদ্ধি পায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, ভারত ও শ্রীলঙ্কার মধ্যে FTA সাক্ষরিত হওয়ার পরে অনেকগুলি ভারতীয় কোম্পানি শ্রীলঙ্কায় FDI করেছে। এদের মধ্যে অন্যতম হল : CEAT, Gujarat Glass, Tatas, Indian Oil, Gujarat Ambuja, Bharti Airtel, NTPC, Indian Hotels, SBI, Indian Bank, ICICI Bank, Indian Overseas Bank, L&T, Cairn India, Mphasis (Construction World, 2013)।

এছাড়াও, কিছু কিছু গবেষণায় দেখা গেছে যে, গ্রাহক দেশের বিদেশি মুদ্রার বিনিময় হারও FDI-এর এক গুরুত্বপূর্ণ আকর্ষণ, যা একেবারেই আশ্চর্যজনক নয়। যদি ভারতীয় মুদ্রায় US ডলারের দাম প্রতি বছর ২ শতাংশ করে বাড়ে (Rupee depreciation), US ডলারে মাপা ভারতে তৈরি পণ্যের উৎপাদন খরচও সমান হারে কমবে, যা কিনা আমেরিকার কোম্পানির কাছে ভারতে FDI করাটা লাভজনক করে তোলে (Lokesha and Leelavathy, 2012)।

FDI-এর উপরোক্ত নির্ধারকগুলি গ্রাহক বা প্রাপক (Recipent) দেশের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। (বহির্মুখী) FDI-এর কয়েকটি নির্ধারক উৎস দেশের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। যথা, উৎস দেশে কম সুদের হার (এবং সেহেতু ব্যবসায়ে কম লাভের হার) সেই দেশ থেকে অন্য দেশে (যেখানে সুদের হার বেশি) FDI যেতে উৎসাহিত করে। কোনও দেশে অর্থনৈতিক বৃদ্ধির হার কম হলে বা বিনিয়োগের সুযোগ সীমিত হলে (যা কিনা উন্নত দেশগুলিতে প্রায়শই হয়ে থাকে), ওই দেশের বহুজাতিক সংস্থা দ্রুত বৃদ্ধির দেশে (প্রধানত, উন্নয়নশীল দেশগুলি) FDI করে থাকে।

অন্তর্মুখী FDI-এর নিরিখে কেবলমাত্র ভারতের অভিজ্ঞতা নিয়ে গবেষণা করে Archana, Nayak and Basu (2007) দেখিয়েছেন যে গবেষণা ও বিকাশ (Research & Development বা R&D)-এর খাতে কোম্পানির খরচের ওপর ওই কোম্পানিগুলিতে FDI-এর আকর্ষণ অনেকাংশেই নির্ভরশীল। আর এটা সেই শিল্পগুলির ক্ষেত্রে বিশেষভাবে সত্যি যেগুলি R&D-র ওপর খুব বেশি নির্ভর করে, যেমন, সফ্‌টওয়্যার (software) শিল্প।

ভারতে অন্তর্মুখী FDI-এর পরিমাণ

১৯৮০-র দশক থেকে শুরু করে প্রায় তিন দশক ধরে (প্রায় ২০১০ অবধি) চিন

অর্থনৈতিক বৃদ্ধির একটা বিরাট হার (বার্ষিক প্রায় ১০ শতাংশ) বজায় রেখেছে। দেশটি বছরের পর বছর ধরে বিশাল পরিমাণে অন্তর্মুখী FDI পেয়ে এসেছে। চিনে অর্থনৈতিক সংস্কার শুরু হয় ১৯৭০-র দশকের শেষ ভাগে। আর ভারতে তা শুরু হয় ১৯৯১-এ। প্রায়শই বলা হয়ে থাকে যে গত দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে মোট পরিমাণ এবং আপেক্ষিক হিসেবের নিরিখে চিন ভারতের থেকে অনেক বেশি FDI পেয়ে এসেছে। অর্থাৎ, ভারতের ক্ষেত্রে FDI প্রাপ্তির হার নগণ্য। কথাটা খুব একটা ভুল নয়।

১৯৮০-র দশক থেকেই চিন রপ্তানি-নির্ভর বৃদ্ধির কৌশল (strategy of export-led growth) গ্রহণ করে। যার প্রধান বৈশিষ্ট্য ভরতুকির কাঁচামাল এবং সুদের হার। সাথে সাথে FDI-এর জন্য বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল বা Special Economic Zone (SEZ) তৈরি করা হয় দেশটির পূর্ব উপকূলে। এই SEZ-গুলিতে মজুরি বা অনুরূপ আইনকানুন প্রযোজ্য হ'ত না। এর সাথে যোগ হয় চিনের বন্দরগুলির পরিচালন ক্ষমতার অপরিসীম দক্ষতা। এর ফলে চিনে হুহু করে FDI আসতে থাকে। যার প্রধান উদ্দেশ্য হল প্রায় করমুক্ত, আইনি বেড়াজাল মুক্ত SEZ-গুলিতে উৎপাদন করে সেই পণ্য সারা পৃথিবীতে রপ্তানি করা।

ভারতবর্ষ যেহেতু একটি গণতান্ত্রিক এবং বাজার অর্থনীতিভিত্তিক দেশ, চিন যা করতে পেরেছে সেটা এখানে সম্ভব নয়। চিনের মতো অতদূর যাওয়া তো দূরের কথা, সিঙ্গুর বা নন্দীগ্রামের ঘটনা স্মরণ করলেই বোঝা যায় এদেশের প্রকৃত ছবিটা।

এছাড়াও, ১৯৮০-র দশকের আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতির সঙ্গে ১৯৯০-এর দশকের বা তার পরবর্তীকালের অর্থনৈতিক পরিবেশ সম্পূর্ণ আলাদা ছিল। অন্য সব কিছু বাদ দিলেও একটা পার্থক্য স্পষ্ট লক্ষ্য করা যায়—১৯৮০-র দশকে সোভিয়েত রাশিয়া অটুট ছিল, কিন্তু ১৯৯০-র দশকে যখন ভারত অর্থনৈতিক সংস্কার শুরু করে ততদিনে এই দেশটি প্রায় বারোটি ছোটো-বড়ো দেশে ভেঙে যায়। এর ফলে ভারতের রপ্তানি বাণিজ্য ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

যাই হোক না কেন, চিত্র-১ থেকে দেখা যাচ্ছে যে, ভারতে FDI উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে অর্থনৈতিক সংস্কার শুরু করার পরেই। FDI অভ্যন্তরীণ উৎপাদন (GDP)-এর চার শতাংশে এবং পুঁজি গঠন (Gross Domestic Capital Formation বা GDCF)-এর দশ শতাংশে—এখনও অবধি সর্বোচ্চ মান, পৌঁছোয় ২০০৮-এ। তারপরেই এই মান প্রচণ্ডভাবে পড়ে যায় আন্তর্জাতিক আর্থিক সংকটের জন্য। এক্ষেত্রে এও মনে রাখা দরকার যে চিনের ভাগ্য এই বিষয়ে অনেক ভালো ছিল—১৯৭৪ অবধি (বা সংস্কার শুরুর প্রায় দেড় দশক পর্যন্ত) কোনও আন্তর্জাতিক আর্থিক সংকট দেখা দেয়নি। অথচ ভারতের ক্ষেত্রে মাত্র তিন বছরের মধ্যে প্রথম সংকট (1994, Mexican financial crisis), শুধু তাই-ই নয়, এর পর ঘটতে থাকে একের পর এক আন্তর্জাতিক আর্থিক সংকট—১৯৯৭ (এশীয় আর্থিক সংকট), ১৯৯৮ (রাশিয়া, আর্জেন্টিনা), ডট-কম বাব্‌ল (২০০০), এবং সবশেষে আমেরিকার আবাসন ঋণের সংকট (২০০৬) পরিণত হয় বিশ্বজনীন আর্থিক সংকটে।

"উন্নয়নশীল দেশগুলিতে FDI-এর সুবিধা (বা তার অনুপস্থিতি) বিষয়ে নির্ভরযোগ্য গবেষণামূলক তথ্য পাওয়া খুবই দুরূহ। এর কারণ প্রধানত দু'টি। প্রথমত, কর্মসংস্থান এবং ফ্যাক্টর প্রোডাক্টিভিটি (factor productivity, অর্থাৎ, শ্রম এবং পুঁজির উৎপাদনশীলতা) পরিমাপ করার ব্যাপারে বেশ কয়েকটি পদ্ধতিগত (methodological) সমস্যা আছে। দ্বিতীয়ত, এই বিষয়গুলি পরিমাপ করার জন্য যেসব পরিসংখ্যান পাওয়া যায়, তা মোটেই নির্ভরযোগ্য নয়। এর একটা প্রধান কারণ হল উন্নয়নশীল দেশগুলিতে অসংগঠিত ক্ষেত্রের বিশাল আয়তন।"

ভারতীয় অর্থনীতিতে FDI-এর প্রভাব

উন্নয়নশীল দেশগুলিতে FDI-এর সুবিধা (বা তার অনুপস্থিতি) বিষয়ে নির্ভরযোগ্য গবেষণামূলক তথ্য পাওয়া খুবই দুরূহ। এর কারণ প্রধানত দু'টি। প্রথমত, কর্মসংস্থান এবং ফ্যাক্টর প্রোডাক্টিভিটি (factor productivity, অর্থাৎ, শ্রম এবং পুঁজির উৎপাদনশীলতা) পরিমাপ করার ব্যাপারে বেশ কয়েকটি পদ্ধতিগত (methodological) সমস্যা আছে। দ্বিতীয়ত, এই বিষয়গুলি পরিমাপ করার জন্য যেসব পরিসংখ্যান পাওয়া যায়, তা মোটেই নির্ভরযোগ্য নয়। এর একটা প্রধান কারণ হল উন্নয়নশীল দেশগুলিতে অসংগঠিত ক্ষেত্রের বিশাল আয়তন।

তা সত্ত্বেও, কয়েকটি উদাহরণের সাহায্যে ভারতীয় অর্থনীতিতে FDI-এর সুবিধা ব্যাখ্যা করা যায়। জাপানের সুজুকি-র সঙ্গে ভারত সরকারের সমান-সমান অংশীদারিত্বে মারুতি সুজুকি তৈরি হয় (পরবর্তীকালে সরকারের মালিকানা কমে যায়)। ভারতবর্ষে যাত্রীবাহী গাড়ি (passenger car)-র বাজার আমূল বদলে যায় মারুতির জন্য। এই কোম্পানিটি উপভোক্তার সামনে পছন্দের জন্য অনেকগুলি বিকল্প তো আনেই, তার সঙ্গে প্রচুর প্রত্যক্ষ কর্মসংস্থানও করে। আরও অনেক বেশি কর্মসংস্থান হয় অপ্রত্যক্ষভাবে—অনুসারী (ancillary) শিল্পে (যারা মারুতিকে যন্ত্রাংশ এবং অন্যান্য উপকরণ সরবরাহ করে), ডিলারদের কাছে, এবং পরিবহণ শিল্পে (কারখানা থেকে গাড়িগুলি সারা দেশে ছড়িয়ে দেওয়ার কাজে)।

আর একটি বিশেষ উদাহরণ হল টেলিকম শিল্প। ভোডাফোন মূলত একশো শতাংশ বিদেশি মালিকানাধীন কোম্পানি (যদিও আইডিয়ার সঙ্গে সংযুক্ত হওয়ার পরে তার

কিছুটা পরিবর্তন হবে)। এই কোম্পানিটি যে শুধু প্রত্যক্ষ (এবং অপ্রত্যক্ষ) কর্মসংস্থান করেছে তাই-ই নয়। এটি ভারতে প্রবেশ করার পর থেকে প্রতিযোগিতা বাড়ার ফলে মোবাইল কলের খরচ পড়তে শুরু করে। আজকে ভারতে মোবাইল কল করার খরচ সারা পৃথিবীর মধ্যে সব থেকে নিম্নহারের মধ্যে অন্যতম। এছাড়া লক্ষ লক্ষ দোকানদার ভোডাফোন (এবং অন্যান্য পরিষেবা প্রদানকারী)-র রিচার্জ বিক্রি করে উপার্জন করছে (এটা আবার ধীরে ধীরে কমে আসছে, কারণ উপভোক্তারা অন-লাইন রিচার্জ করার দিকে ঝুঁকেছেন)। এছাড়াও, টেলিকম টাওয়ার ব্যবসাটা তো প্রায় পুরোটাই FDI-এর ওপর নির্ভরশীল। এই টাওয়ার ব্যবসাতেও প্রচুর প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ কর্মসংস্থান হয়েছে। আর একটি ক্ষেত্র যেখানে FDI মূলধন, অভিজ্ঞতা এবং দক্ষতা এনেছে, আর সাথে সাথে উল্লেখযোগ্য রকম কর্মসংস্থানও করেছে সেটা হল বিমা (Life & Non-life)।

মারুতি আবার spill-over প্রভাবের একটা প্রথম শ্রেণির উদাহরণ। এই কোম্পানিটি গাড়ির যন্ত্রাংশ উৎপাদন করার শিল্পটিকে এই দেশে তৈরি করেছে, এবং হাতে ধরে প্রশিক্ষণ দিয়ে পরিণত করে তুলেছে। এর ফলে পরবর্তীকালে অনেকগুলি বিদেশি কোম্পানি ভারতে FDI করতে আগ্রহী হয়েছে এবং করেছে। এমনকি টাটা মোটরস্ বা অশোক লেল্যান্ডের মতো দেশি কোম্পানিগুলিও এর থেকে প্রভূত উপকৃত হয়েছে। আজ ভারতবর্ষের গাড়ির যন্ত্রাংশ শিল্প রপ্তানির মাধ্যমে পৃথিবীর প্রায় সব বড়ো ব্র্যান্ডের মালিক কোম্পানিগুলিকে উপাদান সরবরাহ করছে।

Choi and Back (2017), ১৯৭৮ থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত পরিসংখ্যান ব্যবহার করে দেখিয়েছেন যে (ভারতে) FDI দীর্ঘমেয়াদে Total Factor Productivity (TFP) উন্নত করে, কিন্তু রপ্তানি TFP কমায়। এই রপ্তানি বিষয়ক প্রমাণটি অন্যান্য গবেষকদের পেশ করা প্রমাণের সম্পূর্ণ বিপরীত। লেখকদ্বয় এর ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন এই বলে যে, ভারত রপ্তানি করে প্রধানত প্রাথমিক পণ্য এবং নিম্ন প্রযুক্তির পণ্য। সেক্ষেত্রে এই রকম ফলাফল হতেই পারে।

অন্যদিকে Sahoo (২০০৪), ১৯৭৮-'৭৯ থেকে ২০০০-'০১ সাল অবধি প্রাপ্ত পরিসংখ্যান ব্যবহার করে দেখিয়েছেন যে, FDI পুঁজি গঠনে (capital formation) সাহায্য করে, এবং পুঁজি গঠনও আবার FDI আকর্ষণ করে। ভারতে অভ্যন্তরীণ পুঁজি গঠন উন্নততর পরিকাঠামোর মাধ্যমে FDI আকর্ষণ করে। আবার আরও বেশি FDI আরও উন্নত পরিকাঠামোর চাহিদা বাড়ায়, যা আবার পুঁজি গঠনে সাহায্য করে। এই গবেষক এটাও দেখান যে অভ্যন্তরীণ সঞ্চয় (GDS) FDI বাড়াতে সাহায্য করে, কিন্তু GDS-এর ওপর FDI-এর কোনও প্রভাব নেই; আর FDI রপ্তানি বাড়াতেও সক্ষম হয়নি।

উপসংহার

এতে কোনও সন্দেহই নেই যে, ভারতীয় অর্থনীতিকে FDI এক অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে (কর্মসংস্থান, প্রযুক্তি, পরিচালনার দক্ষতা, প্রতিযোগিতা, ইত্যাদি)। তবে সামগ্রিকভাবে পুরো অর্থনীতির ওপর FDI-এর প্রভাব খুবই সীমিত, যার অন্যতম প্রধান কারণ হল অর্থনীতিতে অসংগঠিত ক্ষেত্রের বিরাট আয়তন। আর একটি কারণ হল আমলাতান্ত্রিকতা—ব্যবসা করার সুবিধা (Ease of Doing Business)-র নিরিখে ভারতের স্থান একেবারেই নিচের দিকে।

যে শিল্পগুলি FDI-এর ফলে বিশেষভাবে উপকৃত হয়েছে সেগুলি হল : মোটর গাড়ি (যাত্রীবাহী এবং বাণিজ্যিক গাড়ি), টেলিকম, বিমা, বৈদ্যুতিক ও বৈদ্যুতিন পণ্য (electrical and electronic goods) ইত্যাদি। এমনকি যে স্টার্ট-আপ-এর বন্যা চলেছে, আমাদের দেশে (বিশেষ করে ২০০৮ থেকে) তার অনেকগুলিরই তহবিল আসছে বিদেশি বিনিয়োগকারী (যেমন, Softbank, Tensent Holding, Tiger Global, Saif Partners, এবং আরও অনেকগুলি)-র করা FDI থেকে।

এই সামগ্রিক পরিস্থিতিতে অদূর ভবিষ্যতে বড়ো কোনও পরিবর্তন আসার সম্ভাবনা কম—FDI কয়েকটি শিল্পক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলবে, এবং সামগ্রিক অর্থনীতিতে এর প্রভাব সামান্যই থাকবে।❑

উল্লেখপঞ্জি :

- অর্চনা, ভি., এন. সি. নায়েক, এবং পি. বসু (2007)। Foreign Direct Investment in India : Emerging Horizon, Indian Economic Review, New Series, Volume 42, নম্বর ২ (জুলাই-ডিসেম্বর)। PP 255-266
- Choi, Yoon Jung, এবং Jungho Baek (2017). Does FDI Really Matter to Economic Growth in India? Economies, Volume 5। ২৩ মে ২০১৮-য় www.mdpi.com/2227-7099/5/2/70/pdf ওয়েবসাইট-টি থেকে পাওয়া।
- Construction World (2013). WE NEED MANY MORE INDIAN COMPANIES TO LOOK AT SRI LANKA, http://www.constructionworld.in/News.aspx?nId=1G7xxXIINZmu+AlagrstQ= মে ২১, ২০১৮।
- Lokesha, B.K. এবং D.S. Leelavathy (2012). Determinants of foreign Direct Investment : A Macro Perspective, Indian Journal of Industrial Relations, Vol. 47, No. 3 (জানুয়ারি) pp 459-469।
- প্রেস ইনফর্মেশন ব্যুরো (2014). Government Accepts the Report of the Committee for Rationalising the Definition of FDI and FII। ২১ জুন, ২০১৪। অর্থমন্ত্রক, ভারত সরকার। ২০১৮-র ২২ মে। http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=105 783 ওয়েবসাইট থেকে পাওয়া।
- ভারতের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক (২০১৮)। FAG on Foreign Investments in India। শেষ হালনাগাদ ২০১৮-র ৭ মে/২০১৮-র ২২ মে https://rbi.org.in/scripts/FAQView.aspx?ID=26 থেকে পাওয়া।
- Sahoo, Dukhbandhu, 2004. An analysis of the impact of foreign direct investment on the Indian Economy. PhD গবেষণাপত্র। Institute for social and Economic Change, Bangalore।

ভারতের আন্তর্জাতিক পরিবেশ চুক্তি ও তাৎপর্য

ড. চন্দ্রিমা সিনহা

ইউরোপের দেশগুলি শিল্প বিপ্লবের পরবর্তী সময়ে উৎপাদন ও তাদের বাজারীকরণের ওপর জোর দেয়। ভারত কিংবা চিন, যাদের জনসংখ্যা বিপুল, তারা এই দেশগুলির কাছে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ও আকর্ষণীয় বাজার হিসাবে বিবেচিত হয়। স্টকহোম কনফারেন্সে ভারতের যোগদান বিশ্ব অর্থনীতিতেও এক নতুন যুগের সূচনা করে। সমগ্র বিশ্ব দ্বিখণ্ডিত হয়, উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের শ্রেণি বিভাগে। কনফারেন্সের অন্তিম ঘোষণায় পরিবেশ সংক্রান্ত সমস্যাগুলিকে চিহ্নিত করা হয় এবং প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণে পরিমিত ব্যবহারকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। পরিবেশ সংরক্ষণে দেশগুলিকে যথাযথ উন্নয়ন উপযোগী পরিবেশ নীতি গ্রহণের উপদেশ দেওয়া হয়।

পরিবেশ সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক চুক্তির ইতিহাস শুরু হয় ১৯৭২ সালের ৫ জুন, সুইডেনের স্টকহোম শহরে। পরিবেশ সংক্রান্ত ভাবনাচিন্তা কোনওকালেই কোনও দেশে বিশেষ গুরুত্ব পায়নি। শিল্প বিপ্লবই ছিল বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালীন লক্ষ্য। সেই প্রেক্ষাপটে বিশ্বের সব দেশকে আমন্ত্রিত করে জাতি সংঘের (United Nations) পরিবেশ সুরক্ষার উদ্যোগটি অবশ্যই অভিনব ছিল। একথা অস্বীকার করার কোনও উপায় নেই যে, পরিবেশ সুরক্ষা যথার্থ অর্থেই এক গ্লোবাল বা আন্তর্জাতিক ইস্যু। সমস্যাটি গ্লোবাল হলে, সমাধানও যে গ্লোবাল হবে, সেটিও অনস্বীকার্য। ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী প্রয়াত শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী তার ভাষণে পরিবেশ সুরক্ষা যে ভারতের প্রাচীন ইতিহাসেও গুরুত্বপূর্ণ ছিল, সেই বিষয়টি বিশ্বের দরবারে তুলে ধরেন। সেই দিনই পরিবেশ সুরক্ষায় আন্তর্জাতিক বোঝাপড়ার বিষয়টিতে ভারতের অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত হয়ে যায়। যদিও পরিবেশ সুরক্ষার আন্তর্জাতিক স্তরে ভাবনাচিন্তাগুলি 'Political Economy'-র সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত সেকথা স্বীকার করতেই হয়। বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে, বিশ্বযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী দেশগুলি অর্থনৈতিকভাবে বিধ্বস্ত ও বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। ক্রমশ তারা বুঝতে পারে, শুধুমাত্র অভ্যন্তরীণ বাজার দেশের অর্থনীতিকে সবল করে তোলার পক্ষে যথেষ্ট নয়। বিশেষত ইউরোপের দেশগুলি শিল্প বিপ্লবের পরবর্তী সময়ে উৎপাদন ও তাদের বাজারীকরণের ওপর জোর দেয়। ভারত কিংবা চিন, যাদের জনসংখ্যা বিপুল, তারা এই দেশগুলির কাছে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ও আকর্ষণীয় বাজার হিসাবে বিবেচিত হয়। স্টকহোম কনফারেন্সে ভারতের যোগদান বিশ্ব অর্থনীতিতেও এক নতুন যুগের সূচনা করে। সমগ্র বিশ্ব দ্বিখণ্ডিত হয়, উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের শ্রেণি বিভাগে। কনফারেন্সের অন্তিম ঘোষণায় পরিবেশ সংক্রান্ত সমস্যাগুলিকে চিহ্নিত করা হয় এবং প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণে পরিমিত ব্যবহারকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। পরিবেশ সংরক্ষণে দেশগুলিকে যথাযথ উন্নয়ন উপযোগী পরিবেশ নীতি গ্রহণের উপদেশ দেওয়া হয়।

স্টকহোম ঘোষণা পরবর্তীকালে ভারত একাধিক বহুপাক্ষিক আন্তর্জাতিক পরিবেশ চুক্তি স্বাক্ষর করে। তার মধ্যে তাৎপর্যপূর্ণগুলি নিম্নে উল্লেখ করা হল।

(১) রামসার কনভেনশান (Ramsar Convention on Wetlands of International Importance) :

আন্তর্জাতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ জলাভূমি-গুলির সংরক্ষণের জন্য এই চুক্তিপত্রটি প্রস্তুত হয় ১৯৭১ সালে এবং কার্যকর হয় ১৯৭৫ সালে। জলাভূমির বাস্তুতান্ত্রিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, বিজ্ঞানগত ও বিনোদনগত গুরুত্বকে স্বীকৃত দিয়ে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ জলাভূমির সুসংহত ব্যবহার ও সংরক্ষণের জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে বিশ্বের সমস্ত দেশেই জমির চাহিদা বৃদ্ধির সূত্রে জলাভূমি বুজিয়ে জমির ব্যবহারও বৃদ্ধি পেয়েছে। তাছাড়া কৃষি, বিদ্যুৎ উৎপাদন,

[লেখক কলকাতাভিত্তিক অসরকারি সংস্থা 'NEWS'-এর প্রকল্প ইন-চার্জ (সুন্দরবনে পরিবেশ সংরক্ষণ ও সামজিক সুরক্ষা বিষয়ক। ই-মেল : sinha.chandrima@gmail.com]

শিল্পক্ষেত্রেও জলের চাহিদা বেড়ে যাওয়ায় অতি ব্যবহার, এক খাত থেকে অন্য খাতে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া, দূষণ ইত্যাদি জলাগুলিকে ক্রমাগত বিপর্যস্ত করে তুলেছে। রামসার কনভেনশান মূলত জলাভূমির সঠিক ব্যবহার (wise use) ও তার জন্য আন্তর্জাতিক সহযোগিতার একটি ফ্রেমওয়ার্ক প্রদান করে থাকে। জাতি সংঘের প্রায় ৯০ শতাংশ দেশই এই চুক্তিতে সাক্ষর করেছে। ভারতে এই কনভেনশানটি লাগু হয় ১৯৮২ সালের পয়লা ফেব্রুয়ারি। প্রায় ২,১২২-টি রামসার সাইটস (৫০৭,৪৭০,৮০০ একর) নথিভুক্ত করা হয়েছে, যার মধ্যে ২৬-টি সাইটস ভারতে অবস্থিত। এর মধ্যে মণিপুরে অবস্থিত লোকটাক হ্রদ ও রাজস্থানের কেওলাদেও ন্যাশানাল পার্ক বিশেষভাবে সংকটপূর্ণ মনট্রেক্স তালিকাভুক্ত।

(২) বিপন্ন বন্য উদ্ভিদ ও প্রাণী সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কনভেনশন (Convention on the International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora—CITES) :

বিপন্ন উদ্ভিদ ও প্রাণীদের সুরক্ষার জন্য ১৯৭৩ সালে এই বহুপাক্ষিক কনভেনশানটি প্রস্তুত হয় ও ১৯৭৫ সালে আইনত লাগু হয়। এই কনভেশানটি ওয়াশিংটন কনভেনশান নামেও পরিচিত। ষাটের দশকের পর থেকে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ক্ষেত্রটি প্রসারিত হওয়ার সাথে সাথে বন্যপ্রাণী ও উদ্ভিদজাত পণ্যগুলি ক্রমশ বিশ্ব বাজারে পৌঁছাতে থাকে এবং বন্যপ্রাণকে বিপন্ন করে তোলে। বন্যপ্রাণের বাজারীকরণকে নিয়ন্ত্রিত করতেই এই কনভেনশানটি চালু করা হয়। ভারত সরকার ১৯৭৬ সালের জুলাই মাসে এই কনভেনশানটিতে সাক্ষর করে এর সাথে যুক্ত হয় ও অক্টোবর মাসে সংসদের অনুমোদন (Ratification) পায়। বন্যপ্রাণ সংরক্ষণের নির্দেশক (Director, Wildlife Preservation) CITES ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ হিসাবে মনোনীত হয়। বন্যপ্রাণ অপরাধ নিয়ন্ত্রণ সংস্থা বা ওয়াইল্ড লাইফ ক্রাইম কন্ট্রোল ব্যুরো CITES ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের সহকারী হিসাবে কাজ করে। আঞ্চলিক উপ-পরিচালক ছাড়াও কাস্টমস্ কর্তৃপক্ষ, রাজ্য বনবিভাগও কনভেনশান বাস্তবায়নের সঙ্গে জড়িত। কনভেনশানটির কার্যকর বাস্তবায়নের জন্য ১৯৭২ সালের বন্যপ্রাণ সুরক্ষা আইনে সংশোধনেরও প্রস্তাব আনা হয়েছে। CITES বাস্তবায়নে ভারত সরকারকে সাহায্য করার জন্য পরিবেশ ও বন মন্ত্রালয় ২০১০ সালে একটি বিশেষ সেল গঠন করেছে। সাম্প্রতিককালে, CITES বাস্তবায়িত করার জন্য জাতীয় স্তরে ভারত সরকার বেশ কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণে কয়েকটি বেশ জোরদার পদক্ষেপ নিয়ে স্থানীয় মানুষের জীবনজীবিকাকে আকর্ষণীয় করে তুলতে ও বিকল্প জীবিকার সন্ধান দেওয়ার প্রস্তাবকে ভারত সমর্থন করে। অবৈধ হাতি নিধন পর্যবেক্ষণ (MIKE) প্রকল্পের স্বনির্ভর তহবিল গঠনের প্রস্তাব আনে। IUCN-এর বিশেষ তালিকাভুক্ত (Red List) অত্যন্ত সংকটপূর্ণ (critically endangered) ও বিপন্ন (threatened) পর্যায়ভুক্ত উদ্ভিদ ও প্রাণী CITES কনভেনশানের আওতায় থাকা বাণিজ্য পর্যবেক্ষণের অন্তর্ভুক্তিতে ভারত বিশেষ জোর দেয়।

(৩) পরিয়ায়ী প্রজাতি সংক্রান্ত কনভেনশান (Convention on Migratory Species) :

পরিযায়ী স্থলজ ও সামুদ্রিক প্রাণী ও পরিযায়ী পাখিদের সংরক্ষণের এই কনভেনশানটি ১৯৮৩ সালে তৈরি হয়। এটি বন কনভেনশান (BON Convention) নামেও পরিচিত। ভারত সরকার ১৯৮৩ সালে এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করে। বিপন্ন পরিযায়ী প্রজাতি ও লুপ্ত প্রজাতিগুলি কনভেনশানের অ্যাপেন্ডিক্স-I তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। CMS চুক্তিবদ্ধ দেশগুলি এই তালিকাভুক্ত প্রাণীগুলির সংরক্ষণ, তাদের ক্ষতিগ্রস্থ বাসস্থানের পুর্নগঠন ও সংরক্ষণ, পরিযায়ী পথের বাধা-বিপত্তি দূরীকরণ এবং বিপন্ন করার অন্যান্য বিষয়গুলিকে দূরীভূত করার জন্য বিশেষভাবে উদ্যোগী। পরিযায়ী প্রাণীরা (পাখি ও সামুদ্রিক মাছ ইত্যাদি) এক দেশ থেকে অন্য দেশে পাড়ি জমানোর সময় কখনও বা তাদের দীর্ঘ যাত্রাপথের মাঝে অন্য দেশে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেয়। এবার এই যাত্রাপথের মাঝের দেশগুলি একযোগে সংরক্ষণের আওতায় না এলে।

পরিসর পথে অবস্থিত এই দেশগুলিকে এই কনভেনশানে যোগ দেওয়ার আর্জি পেশ করা হয়ে থাকে।

(৪) ভিয়েনা কনভেনশান (1985) ও মনট্রিল প্রোটোকল (1987) :

ভিয়েনা কনভেনশানটি তৈরি হয় বায়ুমণ্ডলে ওজোন স্তরটির সুরক্ষার জন্য ও মনট্রিল প্রোটোকলের উদ্দেশ্য হল, যেসমস্ত পদার্থ বায়ুমণ্ডলের ওজোন স্তর হ্রাস করে তার নিয়ন্ত্রণ। ভারত ভিয়েনা কনভেনশান ও মনট্রিল প্রোটোকলে যোগ দেয় যথাক্রমে ১৮ মার্চ, ১৯৯১ এবং ১৯ জুন ১৯৯২ তারিখে। ভিয়েনা কনভেনশান ও মনট্রিল প্রোটোকলকে পৃথিবীর ইতিহাসে সব থেকে সফল আন্তর্জাতিক চুক্তি বলে মনে করা হয়। কারণ ১৯৭-টি দেশ এই কনভেনশানে যোগ দেয় ও প্রায় ৩০ বছরে ধীরে ধীরে ওজোন স্তর হ্রাসকারী পদার্থগুলির ; যেমন, ক্লোরোফ্লুরো কার্বন (CFCs), কার্বন টেট্রাক্লোরাইড এবং হ্যালোনসের উৎপাদন বা ব্যবহার হ্রাস করে। শুধু তাই নয়, মনট্রিল প্রোটোকল প্রতি বছর প্রায় ১১ গিগাটন কার্বন ডাই-অক্সাইড সমতুল্য গ্রিন হাউস গ্যাস (GHG) নির্গমন হ্রাস করেছে। ভারত সরকার এই চুক্তি স্বাক্ষরের পর ওজোন স্তর হ্রাসকারী পদার্থগুলি ব্যবহার কমানোর দায়িত্ব কেন্দ্রই পরিবেশ ও বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রকের ওপর অর্পণ করেছে। মন্ত্রালয়, দু'টি স্থায়ী কমিটির, প্রযুক্তিগত ও আর্থিক স্থায়ী কমিটি (Technology and Finance Standing Committee) দ্বারা সমর্থিত একটি ক্ষমতাপ্রাপ্ত স্টিয়ারিং কমিটি (Empowered Steering Committee) তৈরি করে কনভেনশান ও প্রোটোকল বাস্তবায়নের জন্য। এছাড়া মন্ত্রণালয় মন্ট্রিল প্রোটোকল কার্যকর করে ওজোন স্তর হ্রাসকারী পদার্থের উৎপাদন ও ব্যবহার হ্রাস করতে জাতীয় ওজোন ইউনিট হিসাবে কাজ করার জন্য একটি ওজোন সেল তৈরি করে।

ভারত সরকার মন্ট্রিল প্রোটোকলের আর্থিক তহবিল থেকে অনুদান জোগাড় করে জাতীয় শিল্প উন্নয়ন কৌশল তৈরি করে ধীরে ধীরে CFCs ব্যবহার কমায় ২০০৮-এর মধ্যে। শুধুমাত্র হাঁপানি ও COPD-এর চিকিৎসায় ইনহেলারে CFC ব্যবহার করা হচ্ছিল, সে-ও বন্ধ করা হয় ২০১২ সালে। ভারতে CTC ও হ্যালোনের উৎপাদন ও ব্যবহার পুরোপুরি বন্ধ হয় ২০১০ সালে। বর্তমানে ভারত সরকারের ওজোন সেলটি হাইড্রোক্লোরোফ্লুরো কার্বন উৎপাদন

ও ব্যবহার দ্রুতগতিতে হ্রাস করার প্রচেষ্টায় নিযুক্ত আছে।

(৫) বেসিল কনভেনশান : বিপজ্জনক বর্জ্য পদার্থের আন্তর্দেশীয় চলাচল ও ব্যবস্থাপনা নিয়ন্ত্রণ :

এই আন্তর্জাতিক চুক্তিটি উন্নত দেশগুলির ক্ষতিকর বর্জ্য পদার্থ সম্ভার অনুন্নত দেশে পাচার রোধ করার জন্য তৈরি হয়েছে। এই চুক্তি দ্বারা তেজস্ক্রিয় বর্জ্য নিয়ন্ত্রণ সম্ভব নয়। তবে ক্ষতিকর বিষাক্ত বর্জ্য পদার্থ মূলত উৎপাদন ক্ষেত্রেই নিয়ন্ত্রণ করার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। চুক্তিতে সাক্ষর ১৯৮৯ সালে শুরু হয় ও ৫ মে ১৯৯০ সালে আইনত তা চালু হয়। এখনও পর্যন্ত ১৮৫-টি দেশ ও ইউরোপিয়ান ইউনিয়ান এই কনভেনশানে যোগ দিয়েছে।

ভারত সরকার শুরুতে এই কনভেনশানের পক্ষে, অর্থাৎ OECD (Organization of Economic Cooperation and Development)-র অন্তর্ভুক্ত ২৭-টি ধনী দেশের থেকে বিপজ্জনক বর্জ্য পদার্থগুলিকে OECD-র নয় এমন দেশে পাচার করার বিপক্ষে মতামত দেয়। প্রকৃতপক্ষে দেখা যায়, বেসিল কনভেনশান অনুযায়ী বিপজ্জনক বর্জ্য পদার্থ নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা সত্ত্বেও অনুন্নত দেশগুলি ক্রমশ উন্নত দেশগুলির উৎপাদিত বর্জ্য পদার্থের dumping ground-এ পরিণত হয়েছে। মূল বেসিল কনভেনশনে বর্জ্য পদার্থ উৎপাদন নিয়ন্ত্রণের কথা বলা হলেও পুরোপুরি নিষিদ্ধ করার কথা বলা হয়নি। কিন্তু আফ্রিকার দেশগুলি পুরোপুরি নিষেধাজ্ঞা দাবি করে ও সংশোধনী প্রস্তাব দেয়। ১৯৯৮ সালের নিষেধাজ্ঞাজনিত সংশোধনীটির বিরোধিতা করে আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, জার্মানি, কানাডা, জাপান, ইংল্যান্ড।

এই নিষেধাজ্ঞা এখনও কার্যকর হয়নি। এই আইন সংশোধন করার জন্য ৬২-টি দেশের অনুমোদন পাওয়া প্রয়োজন। ভারত বেসিল কনভেনশানে যোগ দিলেও ভারতীয় সংসদ এই সংশোধনীর সপক্ষে অনুমোদন দেয়নি। সংশোধনী অনুমোদন করার জন্য পরিবেশপ্রেমীরা ভারত সরকারকে আহ্বান জানিয়েছেন। কিন্তু ভারত সরকার এখনও বর্জ্য পদার্থের পাচারের বিরুদ্ধে জোরদার মতামত জানায়নি, বরং নরম মনোভাবের পরিচয় দিয়ে COP3-তে তদানীন্তন পরিবেশমন্ত্রী কমলনাথ জানান, "ভারত সরকার পরিবেশগতভাবে ক্ষতিকর বর্জ্য পুর্নব্যবহারের বিরুদ্ধে। আমরা বর্জ্য পদার্থ অন্য দেশে রপ্তানি করার আন্দোলনের বিরুদ্ধে নই, কিন্তু মনে করি, এটি মোকাবিলা করার জন্য আমদানিকারী দেশের সঠিক সুবিধা থাকা দরকার।" অর্থাৎ কিছু সুযোগসুবিধার ব্যবস্থা থাকলে ভারত সরকার বিপজ্জনক বর্জ্য পদার্থের dumping ground হতে রাজি আছে। ফলস্বরূপ, ভারত বেসিল কনভেনশানের নিষেধাজ্ঞা সংশোধনীটি অনুমোদন করেনি এবং বিপজ্জনক বর্জ্য আমদানি করে ক্রমশ একটি ডাম্পিং গ্রাউন্ডে পরিণত হচ্ছে।

(৬) জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক কনভেনশান (United Nations Framework Convention on Climate Change 1991 ও কিয়োটো প্রোটোকল 1997) :

১৯৮৮ সালে গঠিত IPCC-র (Intergovernmental Panel on Climate Change) গবেষণায় দেখা যায়, বিশ্বের উষ্ণায়ণের ফলে সমুদ্র জলতলের উচ্চতা বৃদ্ধি ও সমুদ্রের আশপাশের নিচু জায়গা ও দ্বীপ দেশগুলির প্লাবিত হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল।

পৃথিবীর জলবায়ু পরিবর্তন ও বিশ্ব উষ্ণায়ণের কারণ হিসাবে বিজ্ঞানীরা গ্রিন হাউস গ্যাসের অতিরিক্ত নির্গমনকে দায়ি করেছেন। এই গ্রিন হাউস গ্যাসের নির্গমন মূলত যানবাহনের ব্যবহার ও শিল্পের সাথে জড়িত। রিও ডি জেনেরিও-তে আর্থ সম্মেলন চলাকালীন রাষ্ট্রসংঘ এই কনভেনশানটি পেশ করে। ১৯১৭ সালে জাপানের কিয়োটো শহরে সম্মেলন চলাকালীন প্রথম সংযোজন হিসাবে কিয়োটো প্রোটোকলটি গৃহীত হয়। এই প্রোটোকল মূলত গ্রিনহাউস গ্যাস, যেমন, কার্বন ডাই-অক্সাইড, নাইট্রাস অক্সাইড, পারফ্লুরোকার্বন, হাইড্রোফ্লুরোকার্বন, সালফার হেক্সাক্লোরাইডের নির্গমন হ্রাস করার লক্ষ্য গ্রহণ করে। এই আন্তর্জাতিক চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী দেশগুলির তরফে নিজ নিজ দেশে এই লক্ষ্যে জাতীয় কর্মসূচি নির্ধারণের কথা বলা হয়। কিয়োটো প্রোটোকলটি Annex-I-কে (OECD-এর অন্তর্ভুক্ত উন্নত দেশ) বাধ্যতামূলকভাবে নিঃসরণ হ্রাস লক্ষ্যমাত্রার (১৯৯০ সালের মাত্রার তুলনায়) জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ করে। উন্নয়নশীল দেশগুলিতে এই GHG নিঃসরণ ঐচ্ছিক, বাধত্যামূলক নয়। এই প্রোটোকলটি ২০০৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বলবৎ হয় Annex-I অন্তর্ভুক্ত ৫৫-টি দেশ অনুমোদন দেওয়ার ৯০ দিন পরে।

ভারত UNFCCC-তে স্বাক্ষর করে ১৯৯২ সালের ১০ জুন এবং সংসদে অনুমোদন পায় পয়লা নভেম্বর, ১৯৯৩-তে। UNFCCC-এ নিয়ম অনুসারে উন্নয়নশীল দেশ হিসাবে ভারতের GHG নিঃসরণ নিয়ন্ত্রণে কোনও আইনানুগ নির্ধারণ মাত্রা আবশ্যক নয়। কারণ GHG নিগর্মনের মাত্রা উন্নত দেশগুলির তুলনায় আমাদের কম এবং আর্থিক ও প্রযুক্তিগত ক্ষমতাও উন্নয়নশীল দেশগুলির উন্নত বিশ্বেরই অধিক। কাছেই উন্নত দেশগুলি থেকে সংগৃহীত অর্থ দিয়ে উন্নয়নশীল দেশগুলিতে পরিবেশ-বান্ধব প্রযুক্তি তৈরি হবে। এবং এর সঙ্গে আরও আশা করা হয়েছিল যে, একটি কার্বন মার্কেট তৈরি হবে। যেখানে উন্নত দেশের শিল্প উৎপাদনে মাত্রারিক্ত কার্বন নিঃসরণ হলে তার ক্ষতিপূরণ হিসাবে সমপরিমাণ কার্বন ক্রেডিট (উন্নয়নশীল দেশে ১ টন কার্বন নিঃসরণ হ্রাস করলে ১ কার্বন ক্রেডিট) কার্বন মার্কেট থেকে কিনবে। এছাড়াও প্রযুক্তিগত সুবিধার প্রদানের জন্য কিয়োটো প্রোটোকলে Clean Development Mechanism (CDM) বরাদ্দ করা হয়েছে। ভারত ২০০২ সালের ২৬ আগস্ট কিয়োটো প্রোটোকলটি গ্রহণ করে।

এই চুক্তি অনুসারে প্রতিটি দেশকে GHG নিঃসরণের একটি সম্ভাব্য তালিকা তৈরি করতে হবে ও জাতীয় স্তরে কনভেনশানটির কী কী উপায় তারা অবলম্বন করছে তা UNFCCC-কে নিয়মিত জানাতে হবে। ১৯৯৪ সালকে ভিত্তি করে পাঁচটি ক্ষেত্রে, যেমন বিদ্যুৎ উৎপাদন, শিল্প উৎপাদন, কৃষি, বন ও বর্জ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে GHG নিঃসরণ মাত্রা পরিমাপ করতে হবে।

এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করার পর, ভারত সরকার GHG নিঃসরণ মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করতে নানাবিধ কর্মসূচি গ্রহণ করছে।

(৭) কনভেনশান অন বায়োলজিকাল ডাইভারসিটি বা জীব বৈচিত্র্যের কনভেনশান ১৯৯২ :

বিভিন্ন প্রজাতি নানা প্রাকৃতিক কারণে বিভিন্ন সময়ে লুপ্ত হয়ে গিয়েছে, পরিবেশ ও

প্রকৃতিও অনবরত নানা পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে প্রবহমান, কিন্তু বর্তমানে মনুষ্যসৃষ্ট নানা কারণে বাস্তুতন্ত্রগুলি নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। ফলস্বরূপ নানা প্রজাতির দ্রুত বিলুপ্তি ঘটছে, এবং জীব বৈচিত্র্যের মারাত্মক ক্ষতি হচ্ছে। জীব বৈচিত্র্যের সংরক্ষণের জন্য ১৯৯৩ সালের ২৯ ডিসেম্বর কনভেনশান অন বায়োলজিকাল ডাইভারসিটি, এই বহুপাক্ষিক চুক্তিটি রিও ডি জেনিরিও-তে আয়োজিত আর্থ সমিট চলাকালীন পেশ হয় ও ১৯৯২ সালের ৫ জুন আইনত স্বীকৃতিলাভ হয়। এই চুক্তিটি মূলত তিনটি বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে গঠিত হয় : (১) জীব বৈচিত্র্যের সংরক্ষণ, (২) জীব বৈচিত্র্যের নিয়ন্ত্রিত ব্যবহার, (৩) জিনগত সম্পদের ন্যায্য ও সম অধিকার বণ্টন। এখনও পর্যন্ত মোট ১৯৩-টি দেশ এই চুক্তিতে যোগ দিয়েছে। জীব বৈচিত্র্যের কনভেনশানকে Sustainable Development বা স্থায়ী উন্নয়নের মূল চাবিকাঠি হিসাবে ধরা হয়। প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা বাস্তুতন্ত্রকেন্দ্রিক করার কথা এই চুক্তিতে উল্লিখিত আছে। জীব বৈচিত্র্য হ্রাস বা বিলুপ্তি নিয়ন্ত্রণ করার জন্য এই কনভেনশানে উল্লিখিত সর্বস্তর বিধিবিধান নীতিপ্রবক্তাদের জীব বৈচিত্র্য সংরক্ষণের পথ প্রদর্শন করল মনে করা হয়। নানাবিধ প্রজাতির জীবকুল, বাস্তুতন্ত্র ও জীবনের সমাহার মানুষের কল্যাণে ব্যবহৃত হওয়াই সমীচীন।

ভারত এই প্রোটোকলে ২০১১ সালের ১১ মে স্বাক্ষর করে ও ২০১২ সালের ৯ অক্টোবর সংসদে তা অনুমোদিত হয়। এই চুক্তিতে যোগদানকারী দেশগুলির ১১তম সম্মেলন (CoP11) ২০১২ সালে হায়দরাবাদে অনুষ্ঠিত হয়। এই প্রটোকলের নির্দেশ অনুযায়ী পরিবেশ ও বন মন্ত্রক, National Biodiversity Strategy and Action Plan প্রস্তুত করে ২০০০-২০০৪ সালে। যার ওপর নির্ভর করে তৈরি হয় জাতীয় জীব বৈচিত্র্য কর্মপরিকল্পনা (National Biodiversity Action Plan), যা ২০০৮ সালে সংসদে অনুমোদিত হয়। ২০১৪ সালে জাতীয় জীব বৈচিত্র্য কর্মপরিকল্পনায় একটি সংযোজন আনা হয়, যেখানে ভারত জীব বৈচিত্র্য রক্ষায় ১২-টি লক্ষ্য এবং পর্যবেক্ষণের নির্দেশক (indicator) নির্দিষ্ট করে।

(৮) কার্টাজেনা প্রোটোকল (Cartagena Protocol on Bio-safety) :

কার্টাজেনা, জৈব নিরাপত্তা প্রোটোকলটি জীব বৈচিত্র্যের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত একটি আন্তর্জাতিক চুক্তি। এই চুক্তির মূল উদ্দেশ্য হল আধুনিক জৈবপ্রযুক্তিতে উৎপন্ন জিনগতভাবে পরিবর্তিত জীবের (Living Modified Organ বা LMO) নিরাপদ হ্যান্ডলিং, পরিবহণ এবং ব্যবহারকে নিয়ন্ত্রণ। কারণ, LMO-গুলির অপরিমিত ও অনির্দিষ্ট ব্যবহার যেমন মানব স্বাস্থ্যের হানি ঘটাতে পারে, তেমনই স্থানীয় জীব বৈচিত্র্যের ওপরও ক্ষতিকর প্রভাব বিস্তার করতে পারে। এই বহুপাক্ষিক চুক্তিটি ২০০০ সালের ২০ জানুয়ারি গ্রহণ করা হয় ও ২০০৩ সালের ১১ সেপ্টেম্বর তা কার্যকর হয়।

চুক্তিটি কিন্তু জৈবপ্রযুক্তি ব্যবহার করে উৎপাদিত জিনগতভাবে পরিবর্তিত জীবের আমদানি বা রপ্তানিকে নিষিদ্ধ করেনি। চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী দেশগুলির ক্ষেত্রে অন্য যেকোনও দেশের সাথে LMO সংক্রান্ত ব্যবসা করারও কোনও বাধা নেই, শুধু সতর্ককতামূলক কিছু নির্দেশিকার কথা বলা হয়েছে। আন্তঃসীমানা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে LMO-গুলির পৃথকীকরণ (segregation) ও চিহ্নিতকরণ (labelling) আবশ্যিক। যে দেশ LMO গ্রহণ করেছে, তার কাছে পূর্ব নির্দিষ্ট LMO-র বিস্তারিত বিবরণ পাঠানোটাও রপ্তানিকারক দেশের ক্ষেত্রে জরুরি।

এই চুক্তি অনুসারে, গ্রহীতা দেশে একটি Bio-safety Clearing House থাকবে ও একটি DNA (Designated National Authority) থাকবে, যারা ছাড়পত্র দিলে তবেই সেই দেশে বিদেশ থেকে আসা LMO ব্যবহারের অনুমতি মিলবে। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার (World Trade Organization বা WTO) একাধিক চুক্তি, যেমন Agreement of Sanitary and Phytosanitary Measures (SPS Agreement), বাণিজ্যে প্রযুক্তিগত বাধা সংক্রান্ত চুক্তি (TBT Agreement), Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs) ইত্যাদি কার্টাজেনা প্রোটোকলের পরিপূরক।

বর্তমানে ভারত-সহ ১৭১-টি দেশ এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে। এই চুক্তিটি ২০০০ সালের ২৯ জানুয়ারি গৃহীত হয় ও ২০০৩ সালের ১১ সেপ্টেম্বর কার্যকর হয়।

পরিশেষে

ভারত একের পর এক বহুপাক্ষিক ও দ্বিপাক্ষিক চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে, বিভিন্ন সম্মেলনে যোগ দিয়েছে, দেশে আন্তর্জাতিক সম্মেলনের আয়োজনও করেছে। বিভিন্ন দেশের সঙ্গে ভারতের সম্পর্কের উন্নতি হয়েছে। সবার কাছে ভারতের দ্বার হয়েছে অবারিত। কিন্তু তাতে ভারতের পরিবেশ বা জীব বৈচিত্র্যকে কতটা সুরক্ষা দিতে পারা গেছে তা আলোচনাসাপেক্ষ ও তর্কসাপেক্ষ। এই সূত্র ধরে ভারতের বাজারে বহুজাতিক কোম্পানিগুলি উপস্থিত হয়েছে, ও ভারতীয় প্রাকৃতিক সম্পদের অপব্যবহার ও ধ্বংস চলছেই। এই চুক্তিগুলি পরিবেশের সার্বিক সুরক্ষার জন্য তৈরি হলেও অনেক ক্ষেত্রেই একপেশে ও রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। কার্টাজেনা প্রোটোকলে বড়ো বড়ো কথা বলা হলেও, বহুজাতিক কোম্পানি মনস্যান্টো BT বেগুন ভারতে কৃষকের হাতে তুলে দিলে, কৃষকেরা প্রত্যাখ্যান করে ও বিক্ষোভ করে। যদিও এই BT বীজ Bio-safety-র Clearing House-এর প্রাথমিক অনুমোদন পেয়ে গিয়েছিল। BT তুলোর দীর্ঘকালীন ক্ষতিকারক প্রভাব (মানব স্বাস্থ্য ও স্থানীয় জীব বৈচিত্র্যের উপর) থেকে অভিজ্ঞতালাভ করায় কৃষকেরাই রুখে দাঁড়ায়। কিয়োটো প্রোটোকলে CDM-এর সাহায্যে পরিবেশ-বান্ধব প্রযুক্তির সুরক্ষা থাকা সত্ত্বেও ভারতের বড়ো শহরগুলিতে বায়ুদূষণের রমরমা, মানুষ ফুসফুসজনিত নানা রোগের শিকার। কোনও CMS চুক্তিই পরিযায়ী পাখিদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে পারেনি কোনও দেশেই। ভারত এখনও ক্ষতিকারক বর্জ্যের সেরা dumping ground। জলাশয় বুঁজিয়ে উন্নয়নমূলক কার্যকলাপও ঘটেই চলেছে, এমনকী স্বীকৃত রামসারও এর থেকে রক্ষা পাচ্ছে না। শুধু চুক্তি তৈরি, বা স্বাক্ষর নয়, যথাযথ প্রয়োগে নজর দেওয়ার আশু প্রয়োজন।❑

জানেন কি?

অটল উদ্ভাবন মিশন

দেশে উদ্ভাবন ও উদ্যোগের সংস্কৃতির প্রসার ঘটাতে ভারত সরকারের অগ্রণী প্রকল্প "অটল উদ্ভাবন মিশন (Atal Innovation Mission—AIM)"। আগামীদিনে ভারতে উদ্ভাবন (innovation) ও উদ্যোগ (entrepreneurship) সংক্রান্ত খুঁটিনাটি বিষয়গুলি নিয়ে বিস্তারিত অধ্যয়ন ও পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচারবিবেচনা করার পর নীতি আয়োগ এই প্রকল্পের সূচনা করে।

উচ্চমাধ্যমিক স্কুল, বিজ্ঞান, ইঞ্জিনিয়ারিং তথা অন্যান্য উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ক্ষুদ্র, অতিক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পক্ষেত্র, কর্পোরেট জগৎ ও অ-সরকারি সংস্থা-সহ বিভিন্ন স্তরে উদ্ভাবন ও উদ্যোগের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করতে অটল উদ্ভাবন মিশনের অভীষ্ট লক্ষ্য কেন্দ্র, রাজ্য ও ক্ষেত্রীয় উদ্ভাবন প্রকল্পগুলিকে একছাতার তলায় আনা এবং এদের উদ্ভাবনমূলক নীতির মধ্যে সামঞ্জস্য সুনিশ্চিত করা।

অটল উদ্ভাবন মিশনের দু'টি মৌলিক দিক হল :

(ক) উদ্ভাবকদের সফল উদ্যোগপতি হিসেবে রূপান্তরিত করতে প্রয়োজনমাফিক সহায়তা ও দিকনির্দেশ প্রদান করা তথা স্বরোজগার ও প্রতিভার মাধ্যমে **উদ্যোগের প্রসার।**

(খ) উদ্ভাবনমূলক চিন্তাধারাকে উৎসাহ জোগাতে **উদ্ভাবনের প্রসার।**

সার্বিক লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের নিরিখে এই মিশনের অন্যতম অঙ্গ হল :

(১) *স্কুলে সৃজনশীল ও উদ্ভাবনী চিন্তাধারাকে উৎসাহ দিতে* 'অটল টিংকারিং ল্যাবস' :

অটল উদ্ভাবন মিশনের অঙ্গ হিসেবে সারা দেশজুড়ে প্রত্যেক জেলার স্কুলে স্কুলে উচ্চমানের গবেষণাগার বা ল্যাবরেটরি স্থাপন করা হচ্ছে, যার পোশাকি নাম Atal Tinkering Labs (ATL)। ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণির পড়ুয়াদের হাতের নাগালে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি পৌঁছে দিতে এবং তাদের প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনে সড়গড় করে তুলতে ১২০০ থেকে ১৫০০ বর্গফুট জায়গাজুড়ে উদ্ভাবনের কর্মশালা গড়ে তোলা হচ্ছে, যেখানে থাকছে ত্রিমাত্রিক বা 3D Printer, Robotics, Internet of Things (IoT), miniaturized electronics-এর মতো অত্যাধুনিক প্রযুক্তি নিয়ে হাতে-কলমে কাজ করার জন্য do-it-yourself (DIY) কিট। সরকার এর জন্য ২০ লক্ষ টাকার অনুদান দিচ্ছে। এর ফলে দেশের কোটি কোটি ছাত্রছাত্রীর মধ্যে প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনের মাধ্যমে মুশকিল আসান করার মানসিকতা গড়ে উঠবে।

এধরনের গবেষণাগার গড়ার জন্য ইতোমধ্যে ২৪৪১-টি স্কুলকে চিহ্নিত করা হয়েছে। ২০১৮ সালের মধ্যে প্রত্যেকটি জেলায় এই প্রকল্প প্রসারিত হবে আর সব মিলিয়ে পাঁচ হাজারেরও বেশি গবেষণাগার চালু হয়ে যাবে বলে আশা করা হচ্ছে। এই প্রকল্পের ভূমিকা শুধু অনুদান দেওয়া পর্যন্ত সীমাবদ্ধ নয়; তৃণমূল স্তরে অটল উদ্ভাবন মিশনের আওতায় শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা নিজেদের পারিপার্শ্বিক সমস্যাগুলিকে চিহ্নিত করে ATL প্রযুক্তির মাধ্যমে সেগুলির সমাধানসমূত্র খোঁজার চেষ্টা চালায়—এটাই মিশনের আসল উদ্দেশ্যের মধ্যে অন্যতম। নিখিল ভারত কারিগরি শিক্ষা পর্ষদ AICTE (All India Council of Technical Education)-ও এই কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত—ATL-ভুক্ত স্কুলপড়ুয়ারা যাতে নিকটতম বিশ্ববিদ্যালয়ের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করতে পারে সেব্যবস্থা করায় AICTE।

সম্প্রতি ATL-এর আওতায় ATAL Tinkering Marathon-এর আয়োজন করা হয়, যাতে অংশগ্রহণ করে ৩৫ হাজারেরও বেশি ছাত্রছাত্রী। সেরা ৬৫০-টি উদ্ভাবন

পরবর্তী ধাপে মূল্যায়নের জন্য নির্বাচিত হয়। এর মধ্যে থেকে বেছে নেওয়া হয় শ্রেষ্ঠ ৩০-টি উদ্ভাবন—এগুলিকে স্বীকৃতির জন্য বাছাই করা হয় জাতীয় প্রকল্পের জন্য সাযুজ্য রাখা ছয়টি ভিন্ন ক্ষেত্র তথা ১৭-টি রাজ্য ও ৩-টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মধ্যে থেকে। পৃষ্ঠপোষকতার হাত ধরে এই উদ্ভাবনগুলিকে প্রসারিত ও পণ্যজাত করা যায় কি না, সেই নিরিখে বিবেচনা করা হবে। গত ১৪ এপ্রিল ATL Community Day উপলক্ষ্যে পঞ্চাশ হাজারেরও বেশি বাচ্চারা ATL-এর আওতাভুক্ত প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন নিয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির প্রয়াসে অংশ নেয়।

দেশের প্রত্যেক জেলায় প্রত্যেকটি স্কুলের হাতের নাগালে যাতে অন্তত এক বা একাধিক অটল টিংকারিং ল্যাব থাকা এবং সারা দেশজুড়ে রাজ্যের শিক্ষা দপ্তরের সহায়তায় সেগুলিকে আরও প্রসারিত করার দিকে পাখির চোখ করা হচ্ছে। ATL-এর আওতায় বাছাই করার ক্ষেত্রে সরকারি তথা সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত স্কুল, মেয়েদের স্কুল, উত্তর-পূর্ব ও পার্বত্য জেলা-ভুক্ত স্কুলগুলির ওপর বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে।

(২) ***বিশ্ববিদ্যালয় ও শিল্পক্ষেত্রে উদ্যোগ প্রসারে* 'অটল ইনক্যুবেটরস' :**

অটল উদ্ভাবন মিশনে বিশ্ববিদ্যালয়, অ-সরকারি সংস্থা, কর্পোরেট তথা ছোটো ও মাঝারি শিল্পক্ষেত্রের স্তরে বিশ্বমানের Atal Incubators (AICs) স্থাপন করা হচ্ছে। দেশের সবক'টি রাজ্যে ও প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে নতুন সুস্থায়ী শিল্পোদ্যোগ স্থাপন সংক্রান্ত কর্মকাণ্ডে গতি সঞ্চার করতে এই পদক্ষেপ। এর ফলে ভারতে তথা আন্তর্জাতিক স্তরে বাণিজ্যিক ও সামাজিক উদ্যোগ ক্ষেত্রে তরান্বিত হবে শিল্পোদ্যোগের বিকাশ ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধির গতি। বর্তমান ইনক্যুবেটরসদের কর্মকাণ্ড আরও প্রসারিত করার জন্যও সহায়তা প্রদান করে অটল উদ্ভাবন মিশন।

নতুন ইনক্যুবেটরস স্থাপন বা বর্তমান ইনক্যুবেটরস প্রসারিত করতে অটল উদ্ভাবন মিশনে ১০ কোটি টাকা পর্যন্ত অনুদান দেওয়া হচ্ছে। উদ্দেশ্য, বিশ্ববিদ্যালয় ও শিল্পক্ষেত্রের যুবা তথা উঠতি উদ্যোগপতি গোষ্ঠীকে নতুন শিল্পোদ্যোগ বা স্টার্টআপ স্থাপন করার সুযোগ দিতে যে ১১০-টি শহরকে স্মার্ট সিটি হিসেবে গড়ে তুলতে চিহ্নিত করা হয়েছে, সেগুলির প্রত্যেকটিতে এবং প্রত্যেক রাজ্যের প্রথম সারির পাঁচ-দশটি শিক্ষা/শিল্প প্রতিষ্ঠানে বিশ্বমানের ইনক্যুবেটরস গড়ে তোলার প্রচেষ্টা চালানো।

ইতোমধ্যে চিহ্নিত AICs-এর সংখ্যা ১৯। চলতি অর্থবর্ষের মধ্যে ৫০-টিরও বেশি AICs চালু হয়ে যাবে বলে আশা করা হচ্ছে। অটল উদ্ভাবন মিশনে মহিলাদের নেতৃত্বাধীন ইনক্যুবেটরস ও নতুন শিল্পোদ্যোগ বা স্টার্টআপ স্থাপনের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে।

অটল উদ্ভাবন মিশনে সাম্প্রতিক কার্যকলাপ

অটল নতুন ভারত চ্যালেঞ্জ ও অটল গ্র্যান্ড চ্যালেঞ্জ—*সামাজিক ও বাণিজ্যিক প্রভাবের জন্য প্রযুক্তি-চালিত উদ্ভাবন ও পণ্য সৃষ্টি*

অটল উদ্ভাবন মিশনের আওতায়, পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি, শক্তি সঞ্চয়, নির্দিষ্ট জলবায়ু-উপযুক্ত কৃষি, সকলের জন্য পানীয় জল, স্বচ্ছ ভারত, পরিবহণ, শিক্ষা, রোবোটিক্স-এর সাহায্যে স্বাস্থ্যপরিচর্যা, 'ইন্টারনেট অব থিংস' প্রযুক্তি, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, ব্লক-চেন, 'অগমেন্টেড' ও 'ভার্চুয়াল রিয়ালিটি', ব্যাটারি প্রযুক্তি, প্রভৃতি দেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ এই সব ক্ষেত্রে অটল নতুন ভারত চ্যালেঞ্জ (Atal New India Challenges—ANIC) ও অটল গ্র্যান্ড চ্যালেঞ্জ (Atal Grand Challenges—AGC)-এর সূচনা করা হচ্ছে। সম্প্রতি প্রকাশিত অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৭-'১৮-তে উল্লিখিত অগ্রাধিকারের বিষয়গুলির সঙ্গেও এই সব ক্ষেত্র নির্বাচনের সামঞ্জস্য আছে। প্রথম খেপে গত ২৬ এপ্রিল ১৭-টি অটল নতুন ভারত চ্যালেঞ্জ-এর সূচনা হয়। নীতি আয়োগের মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিক ভারতের অনন্য সমস্যার অনন্য প্রযুক্তিগত সমাধানসূত্র চিহ্নিত করার ওপর জোর দেন। অটল নতুন ভারত চ্যালেঞ্জ ও অটল গ্র্যান্ড চ্যালেঞ্জ-এর সফল আবেদনকারীরা যথাক্রমে এক ও তিরিশ কোটি টাকা পর্যন্ত অনুদান পেতে পারেন।

নির্দিষ্ট জলবায়ু-উপযুক্ত কৃষি, সড়ক ও রেলের জন্য কুয়াশায় দৃশ্যমানতা বজায় রাখার বিশেষ ব্যবস্থা, বিকল্প জ্বালানী-চালিত পরিবহণ, 'স্মার্ট মোবিলিটি', জলের গুণমান পরীক্ষা করার তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা, সাশ্রয়ী মূল্যে নির্লবণীকরণ/পুনর্ব্যবহারের প্রযুক্তি, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা তথা পুনর্ব্যবহার, আবর্জনা ব্যবস্থাপনার যন্ত্র, সারের গুণমান, সর্বজনীন স্থানে বর্জ্য এবং জনগণকে আবর্জনা ছড়ানো নিয়ে সচেতন করার মতো বিষয়গুলি-সহ অটল নতুন ভারত চ্যালেঞ্জ-এর আওতায় ১৭-টি ক্ষেত্রকে চিহ্নিত করা হয়েছে। বিস্তারিত তথ্য জানা যাচ্ছে http://aim.gov.in/atal-new-india-challenge.php থেকে।

উদ্ভাবন ও উদ্যোগের সংস্কৃতি প্রসারিত করতে গত মার্চ মাসে অটল উদ্ভাবন মিশন জার্মানির SAP প্রযুক্তি কোম্পানির সঙ্গে ইচ্ছাপত্র (Statement of Intent—SoI) সই করে। সেই চুক্তি অনুযায়ী সারা দেশজুড়ে মাধ্যমিক স্তরের পড়ুয়াদের মধ্যে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ইঞ্জিনিয়ারিং ও অঙ্ক বিষয়ে পঠনপাঠনে বাড়তি উৎসাহ জোগাতে ২০১৮ সালে SAP আগামী পাঁচ বছরের জন্য ১০০-টি অটল টিংকারিং ল্যাব 'দত্তক' নেবে।❑

যোজনা ? ক্যুইজ

এবারের বিষয় : পরিবেশ

১. বিশ্বের কোন দেশে মাথাপিছু কার্বন ডাই-অক্সাইড নিঃসরণের পরিমাণ সবচেয়ে বেশি?
২. বিশ্বের কোন দেশটি বর্তমানে সবচেয়ে বেশি বায়ুদূষণের শিকার?
৩. ভারতীয় বন আইন সংশোধন করে কোন উদ্ভিদকে সম্প্রতি তার আওতা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে?
৪. ২০১৭ সালে ভারত কোন বায়ুদূষক বিষাক্ত গ্যাস নিঃসরণের নিরিখে বিশ্বের দেশগুলির মধ্যে শীর্ষে ছিল?
৫. ভারতীয় মোটর যান আইন অনুযায়ী, দেশে গাড়ির হর্নের শব্দের মাত্রা কততে বেঁধে দেওয়া হয়েছে?
৬. বিশ্বের কোন দেশে পরিবেশ দূষণজনিত কারণে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক মানুষের মৃত্যুর ঘটনা ঘটে?
৭. রাষ্ট্রসংঘের পরিবেশ বিষয়ক শাখা, United Nations Environment Programme (UNEP)-এর মতে সম্পূর্ণভাবে সৌরশক্তি-চালিত বিশ্বের প্রথম বিমানবন্দর কোনটি?
৮. সম্প্রতি কেন্দ্রীয় পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রক, জাতীয় জীববৈচিত্র্য কর্তৃপক্ষ এবং রাষ্ট্রসংঘ উন্নয়ন প্রকল্প যৌথভাবে অরুণাচল প্রদেসের অ-সরকারি সংস্থা Singchung Bugun Community Reserve-কে কী পুরস্কারে ভূষিত করে?
৯. সম্প্রতি দক্ষিণ আফ্রিকার ডারবানে BASIC-ভুক্ত দেশগুলির পরিবেশমন্ত্রীদের ২৬তম মন্ত্রীপর্যায়ের অধিবেশন আয়োজিত হয়। BASIC-ভুক্ত দেশগুলির নাম কী?
১০. GSDP কী?
১১. South Asia Wildlife Enforcement Network (SAWEN) একটি আন্তঃসরকারি বন্যপ্রাণী আইন প্রণয়নকারী এজেন্সি। গত ৮-১০ মে কোন শহরে তাদের চতুর্থ অধিবেশন আয়োজিত হয়?
১২. হালে কোন দেশে কার্বন নজরদারি ব্যবস্থা বা Carbon Monitoring System (CMS) প্রকল্প বাতিল হয়?
১৩. গোয়ায় সম্প্রতি আবিষ্কৃত নতুন প্রজাতির ব্যাঙের নাম কী দেওয়া হয়েছে?
১৪. পুণের Indian Institute of Tropical Meteorology (IITM) থেকে চালিত এক ব্যবস্থা দ্বারা দিল্লি, মুম্বাই, পুণে ও আহমেদাবাদ শহরে দূষণের পূর্বাভাস জানা যায়। সেই ব্যবস্থার নাম কী?
১৫. ক্ষতিকারক 'সি টিঙ্কেল' বা Noctiluca algae-এর অস্তিত্ব কীভাবে মুম্বাইয়ের সমুদ্রতীরে বোঝা যায়?
১৬. বিশ্ব বন্যপ্রাণী তহবিলের ভারতীয় শাখা ও পাঞ্জাব সরকার সাম্প্রতিককালে প্রথমবার কোন প্রাণীর গণনা শুরু করে?
১৭. সম্প্রতি পশ্চিমঘাট পর্বতে ঘাস-জাতীয় যে নতুন উদ্ভিদ প্রজাতির সন্ধান পাওয়া গেছে, তার নাম কী?
১৮. 'ভারত স্টেজ-ফোর' মানের জ্বালানি ভারতে প্রথম কোন শহরে চালু করা হয়?
১৯. এদেশে কীটপতঙ্গের জাদুঘর প্রথম কোথায় গড়ে তোলা হয়?
২০. Ptilomera nagalanda কী?

উত্তর :

১. কাতার (মূলত জীবাশ্ম জ্বালানি পোড়ানো এবং সিমেন্ট উৎপাদনের সূত্রে সেদেশে এত বেশি পরিমাণ CO_2 নিঃসরণ হয়। ২. টোকিও (জাপান)। ৩. বাঁশ (দীর্ঘ ৯০ বছর পর)। ৪. সালফার ডাই-অক্সাইড। ৫. ৯৩-১১২ ডেসিবল। ৬. ভারত (একটি হিসাব অনুযায়ী, গোটা বিশ্বে পরিবেশ দূষণের কারণে বছরে ৯০ লক্ষ মানুষের অকালমৃত্যু হয়, তার ২৮ শতাংশই এদেশে)। ৭. ভারতের কোচিন আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর। ৮. India Biodiversity Award, 2018। ৯. ব্রাজিল, দক্ষিণ আফ্রিকা, ভারত ও চিন—২০০৯ সালের নভেম্বরে গঠিত। ১০. কেন্দ্রীয় পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রক ও জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের সবুজ দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্প, যার পোশাকি নাম Green Skill Development Programme। ১১. কলকাতা। ১২. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র; ট্রাম্প প্রশাসন অর্থাভাবের অজুহাতে নাসার এই প্রকল্প বাতিল করে। ১৩. Fejervarya goemchi। ১৪. System of Air Quality and Weather Forecasting and Research (SAFAR)। ১৫. অন্ধকারে সমুদ্রের তীর জ্বলজ্বল করে। ১৬. সিন্ধু নদের বিশেষ প্রজাতির শুশুক, 'ইন্দাস ডলফিন'। ১৭. Fimbristylis agasthyamalaensis। ১৮. দিল্লি। ১৯. কোয়েম্বাটোরে তামিলনাড়ু কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে। ২০. সম্প্রতি নাগাল্যান্ডে হদিশ মেলে 'water stryder' গোত্রের নতুন প্রজাতির পতঙ্গের।❑

যোজনা ||| নোটবুক

নিপা ভাইরাস

রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণুর তালিকায় শীর্ষ স্থানে দুই শত্রু—ব্যাক্টিরিয়া এবং ভাইরাস। ব্যাক্টিরিয়া একাধিক সংক্রামক রোগের কারণ, নিমোনিয়া, যক্ষ্মা, টাইফয়েড, কলেরা, প্লেগ কিংবা ডিপথেরিয়া। কিন্তু মানুষের আরেক শত্রু ভাইরাসের প্রকোপ আরও চরম—সর্দি বা ইনফ্লুয়েঞ্জার মতো সাধারণ উৎপাত থেকে হাম, বসন্ত, পীতজ্বর, জলাতঙ্ক, পোলিও কিংবা এনসেফ্যালাইটিসের মতো মারাত্মক রোগও। অথচ আয়তনে ওই ভাইরাস সূচাগ্রের হাজার ভাগের এক ভাগ মাত্র। হয়তো এই কারণেই ভাইরাসের আবিষ্কার ব্যাক্টিরিয়ার অনেক পরে। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে। ততদিনে জীবাণু হিসাবে ব্যাক্টিরিয়া নানাভাবে পরীক্ষিত। বিজ্ঞানীরা দূষিত তরলকে জীবাণুমুক্ত করতে সূক্ষ্ম ছাঁকনির মধ্যে ফেলতেন। ছাঁকনির উপরে পড়ে থাকত ব্যাক্টিরিয়া, নিচে পরিষ্কার তরল। পরে এক সময় ধরা পড়ল, পরিস্রুত তরলও জীবাণুমুক্ত নয়। তা দূষিত করতে পারে বিশুদ্ধ পদার্থকে। অর্থাৎ, কিছু বিষাক্ত কণা আছে, যারা ব্যাক্টিরিয়ার তুলনায় ক্ষুদ্রতর। এরাই চিহ্নিত ভাইরাস নামে; লাতিন ভাষায় শব্দার্থ 'পূতিগন্ধ' কিংবা 'পঙ্ক'।

প্রায় দু'দশক আগে মালয়েশিয়া এবং সিঙ্গাপুরে শুয়রের মধ্যে নিপা ভাইরাসের আক্রমণ প্রথম আবিষ্কৃত হয়েছিল। ভাইরাসটির মুখ্য বাহক ফল-ভক্ষণকারী বিশেষ শ্রেণির বাদুড় (বৈজ্ঞানিক নাম—Pteropus poliocephalus), শেয়ালের মুখমণ্ডলের সঙ্গে সাদৃশ্য থাকায় যারা 'Grey-headed flying fox' নামেও পরিচিত। উক্ত বাদুড়ের মূত্র, বিষ্ঠা, থুতু কিংবা শুক্রাণুতেও ভাইরাসটি বাস করতে পারে। মরবার সময় বাদুড়ের দেহনিঃসৃত ওই সব পদার্থ পরিবেশে ছড়ালে বিপদের সম্ভাবনা। বাংলাদেশে নিপা-র সংক্রমণের মূলে চিহ্নিত হয়েছে খেজুরের রস পান। শীত ঋতুতে তা এক সুস্বাদু পানীয়। খেজুরের গাছে এবং রসে বাদুড়ের স্পর্শ স্বাভাবিক। ওই স্পর্শের পথে বাদুড়ের দেহনিঃসৃত পদার্থ খেজুরবৃক্ষকে কলুষিত করে বলে অনুমান। অরণ্য-নিধন, যা মানুষের বাসভূমি বৃদ্ধির তাগিদায় সর্বত্র চলছে, সেই কারণেই দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কয়েকটি দেশে বাদুড়-বাহিত নিপা ভাইরাস ছড়াল। ফলে বাস্তুচ্যুত বাদুড়েরা এখন দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ছে, বাড়িছে মানুষের বিপদ।

মালয়েশিয়া এবং সিঙ্গাপুর নিপা-র সংক্রমণে যে ক'জন মানুষ মৃত্যুর মুখে ঢলে পড়েন, তাদের মধ্যে অধিকাংশই শূকর-পালক। অর্থাৎ নিপা সেই শ্রেণির ভাইরাস, যা বন্য ও গৃহপালিত পশু থেকে মানুষের মধ্যে ছড়ায়। ২০০৭ সালের এক সমীক্ষায় জানা যায় যে, ১,৩৯৯ প্রকার জীবাণু মানুষের দেহে বাসা বাঁধতে পারে, তার মধ্যে অধিকাংশই পশু-বাহিত। মানুষের বিপদের মূলে পরোক্ষভাবে জীবাণুগ্রস্ত পশুর দুধ কিংবা ডিম আহার হিসাবে ব্যবহার। সেরকমই মশামাছি কর্তৃক জীবাণু বহণও মানবদেহে সংক্রমণের প্রত্যক্ষ কারণ। অসুস্থ বিড়াল, কুকুর কিংবা বানরের আঁচড় বা কামড়ে ভাইরাস সংক্রমণের একশো শতাংশ সম্ভাবনা। স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা ইদানীং যে দাবি উত্থাপন করছেন, তা ভাববার মতো। তাদের মতে মানুষে স্বাস্থ্যহানি একক বিচার্য বিষয় হতে পারে না। পশু এবং মানবস্বাস্থ্য একত্রে বিচার্য। সেই অনুযায়ী প্রকল্প প্রণয়ন জরুরি।❑

সারণি
নিপা : ভারতের নিরিখে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার পরিসংখ্যান

মাস/ বছর	স্থান	রোগাক্রান্তের সংখ্যা	মৃত রোগীর সংখ্যা	মৃত্যুর হার (শতাংশে)
ফেব্রুয়ারি, ২০০১	শিলিগুড়ি	৬৬	৪৫	৬৮
এপ্রিল, ২০০৭	নদিয়া	৫	৫	১০০
মে, ২০১৮*	কেরালা	১৪	১২	৮৬

*২০১৮ সালের ২৪ মে পর্যন্ত

(কৃতজ্ঞতা স্বীকার : বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা ও আনন্দবাজার পত্রিকা)

যোজনা ডায়েরি

(মে ২০১৮)

আন্তর্জাতিক

- সৌদি আরবে ২৪ জুন থেকে গাড়ি চালানোর অধিকার পাচ্ছেন মেয়েরা। তার আগেই নয়া আইন এনে যৌন হেনস্থাকে কড়া শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত করা হল এই দেশে। এতদিন সৌদি আরবে এই সংক্রান্ত স্পষ্ট আইন ছিল না। যৌন হেনস্থার বিচার চাইতে গিয়ে পালটা বিড়ম্বনায় পড়তে হয়েছে অনেককে। গত ২৮ মে মন্ত্রিসভার উপদেষ্টা 'শুরা কাউন্সিল' যৌন হেনস্থা প্রতিরোধ আইনের খসড়া চূড়ান্ত করে। তাতে বলা হয়, এই অপরাধের সাজা ৫ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড এবং সর্বোচ্চ ৩ লক্ষ রিয়াল (৫ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা) জরিমানা। গাড়ি চালানোর সময়ে মহিলাদের রক্ষাকবচের ব্যবস্থাও এই আইনের অন্যতম উদ্দেশ্য।
- গত ২২ মে এক দিনের ঘরোয়া বৈঠক করতে রাশিয়ার সোচি শহরে গিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে বৈঠকে মস্কোর সঙ্গে সম্পর্ক আরও দৃঢ় করা, আন্তর্জাতিক উত্তর-দক্ষিণ করিডোর গঠন, ব্রিকস নিয়ে আলোচনা করেন। ভারত-রাশিয়া বার্ষিক সম্মেলনের (নভেম্বরে) আগেই মোদী পুতিনের সঙ্গে ঘরোয়া আলোচনা করতে এদিন পৌঁছে যান সোচি।
- গত ৩১ মে ইন্দোনেশিয়া সফরে যান প্রধানমন্ত্রী। তার আগেই ভারতকে কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ সবং বন্দর ব্যবহারের অনুমতি দিল ইন্দোনেশিয়া। গত ১৮ মে সেদেশের সমুদ্রমন্ত্রী লুহুত পান্ডজাতিয়ান জানান, সুমাত্রার উপকূলের কাছে সবং বন্দর ও সবং অর্থনৈতিক এলাকায় লগ্নি করবে ভারত। সেখানে একটি হাসপাতালও তৈরি করবে দিল্লি। আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের কাছে ওই বন্দরটি ডুবোজাহাজ-সহ সব ধরনের জলযানের উপযোগী বলেও মন্তব্য করেছেন তিনি। দু'দেশের উপকূলরক্ষী বাহিনীও একযোগে কাজ করবে বলে জানিয়েছেন তিনি।

● **ফোর্বসের প্রভাবশালীদের তালিকা :**

২০০৯ সালে থেকে বিশ্বের প্রভাবশালী ব্যক্তিদের তালিকা প্রকাশ করে আসছে ফোর্বস ম্যাগাজিন। শেষ তালিকা প্রকাশ হয়েছিল ২০১৬ সালে। চলতি বছর বিশ্বের ৭৫ জন ক্ষমতাশালী মহিলা ও পুরুষকে বেছে নিয়ে ফের তালিকা প্রকাশ করেছে ফোর্বস। বিশ্বে তাদের প্রভাব, সম্পদ এবং ক্ষমতার নিরিখে ফোর্বস এই তালিকায় জায়গা দেওয়া হয়। ২০১৬ সালে শীর্ষে ছিলেন ভ্লাদিমির পুতিন। চলতি বছরে তাকে পিছনে ফেলে ফোর্বস তালিকায় প্রথমে উঠে এসেছেন চিনের প্রেসিডেন্ট তথা কমিউনিস্ট পার্টির প্রধান শি চিনফিং। ২০১২ সালে চিনা কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক ও ২০১৩ সালের রাষ্ট্রের সর্বময় ক্ষমতা হাতে পাওয়ার পর থেকেই চিনে নিজের কর্তৃত্ব নিরঙ্কুশ করেন শি। চলতি বছরে ভ্লাদিমির পুতিনের জায়গা হয়েছে তালিকার দু'নম্বরে। প্রথম দফায় ২০০০ থেকে ২০০৮, এই আট বছরে পরপর দু'বার প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন পুতিন। মাঝখানে দিমিত্রি মেদভেদেভকে প্রেসিডেন্ট পদে বসিয়ে নিজে মাস ছয়েকের জন্য প্রধানমন্ত্রী পদে ছিলেন। তারপর আবার প্রেসিডেন্ট হন। গতবারের দ্বিতীয় স্থান থেকে তৃতীয় স্থানে নেমে এসেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ২০১৭ সালে মার্কিন ইতিহাসে প্রথম বিলিওনেয়ার বা শতকোটিপতি প্রেসিডেন্ট তালিকায় নিজের নাম লিখিয়েছেন ট্রাম্প।

ফোর্বস ক্ষমতাশালী ব্যক্তিদের তালিকায় চতুর্থ স্থানে রয়েছেন জার্মান চ্যান্সেলর অ্যাঙ্গেলা মার্কেল। তিনিই জার্মানির প্রথম মহিলা চ্যান্সেলর। বারে বারেই ক্ষমতার শীর্ষে উঠে এসেছে তার নাম। তবে গতবারের তুলনায় ট্রাম্পের চেয়ে এক ধাপ পিছিয়ে গিয়েছেন তিনি। ১৯৯৮ সালে ফোর্বস-এর বিচারে আমেরিকার প্রথম ৪০০ জন ধনীর তালিকায় নাম ওঠে জেফ বেজোসের। এর পর বিশ্ব জুড়ে ক্রমশ জনপ্রিয় হতে থাকে তার সংস্থা অ্যামাজন। ২০১৭ সালে ফোর্বস তালিকায় বিশ্বের সবচেয়ে ধনী ব্যক্তিদের তালিকায় তৃতীয় স্থানে উঠে আসেন জেফ। চলতি বছর প্রভাবশালী ব্যক্তিদের তালিকায় পঞ্চম স্থানে রয়েছেন জেফ। রোমের ক্যাথলিক চার্চের ২৬৬তম এবং বর্তমান পোপ ফ্রান্সিস (জর্জ মারিও বেরগোগলিও)। ২০১৩ সাল থেকে পর পর তিন বছর বিশ্বের ক্ষমতাশালী ব্যক্তির তালিকায় চতুর্থ স্থানে ছিলেন তিনি। চলতি বছরে রয়েছেন ষষ্ঠ স্থানে। ফোর্বসের বিচারে ২০১৬ সালের পর চলতি বছরে ক্ষমতাশালীদের অলিন্দে সপ্তমেই রয়েছেন মাইক্রোসফটের প্রতিষ্ঠাতা বিল গেটস। ২০১২ সালে চার নম্বর থেকে ২০১৩ ও ২০১৫ সালে ছ' নম্বরে নেমে গিয়েছিল তার নাম।

সৌদি আরবের রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে মহম্মদ বিন সলমনই এখন জনপ্রিয় মুখ। চলতি বছরে ফোর্বসের বিচারে ক্ষমতাশালীদের তালিকায় আট নম্বরে রয়েছে তার নাম। ২০১৫, ২০১৬ এবং ২০১৮—এই নিয়ে তিন বছর ধরে ফোর্বসের বিচারে প্রভাবশালীদের তালিকায় নবম স্থানটি ধরে রেখেছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র

মোদী। গতবার ওই স্থানটি নিয়ে ফেসবুকের কর্ণধার মার্ক জাকারবার্গের সঙ্গে তার জোর টক্কর হয়। তবে মোদী এগিয়ে যান। জাকারবার্গ পিছিয়ে যান দশমে। মার্ক জাকারবার্গকে অনেকটাই পিছনে ফেলে এবছরে এগিয়ে এসেছেন গুগলের সহ-প্রতিষ্ঠাতা ল্যারি পেজ। ২০১৫ সালে প্রথমবার তিনি ফোর্বসের তালিকায় জায়গা করে নিয়েছিলেন। সেবছর ১০ নম্বরে ছিলেন। ২০১৬-তে ছিলেন ৮ নম্বরে। আর চলতি বছর ফের দশে।

● **ব্রেক্সিট সংক্রান্ত ভোটাভুটিতে হার সরকার পক্ষের :**

ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ) ছেড়ে বেরোনোর প্রক্রিয়া নিয়ে পার্লামেন্টে ফের ধাক্কা খেলেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী টেরেসা মে। হাউস অব লর্ডসে গত ৯ মে ব্রেক্সিট সংক্রান্ত চারটি ভোটাভুটিতে হার হয়েছে সরকার পক্ষের। ব্রেক্সিটের সঙ্গে-সঙ্গেই ইউরোপের অভিন্ন বাজার এবং শুল্ক ইউনিয়ন ছাড়ার পরিকল্পনা ছিল টেরেসার। দল-মত নির্বিশেষে একটি সংশোধনী এনে তা আটকে দিয়েছেন উচ্চকক্ষের সদস্যেরা। যাদের মধ্যে রয়েছেন টেরেসার কনজারভেটিভ পার্টির ১৭ জন এবং বিরোধী লেবার পার্টির ৮৩ জন বিদ্রোহী এমপি। অস্বস্তিতে লেবার নেতা জেরেমি করবিনও। কারণ, দলের সদস্যদের ভোটদানে বিরত থাকতে বলেছিল লেবার পার্টি। যা শোনেননি এই ৮৩ জন। ব্রেক্সিট বিলের খসড়া নিয়ে পার্লামেন্টে সাম্প্রতিক অতীতে ১৪ বার হার হল টেরেসার। ইইউ-এর সঙ্গে পাকাপাকি বিচ্ছেদের দিন চূড়ান্ত করে ফেলেছিল সরকার। তারিখটা ঠিক হয়েছিল, ২০১৯ সালের ২৯ মার্চ। কিন্তু ব্রেক্সিট বিলে সেই তারিখ উল্লেখ করা যাবে না বলে আরও একটি সংশোধনী পাশ হয়েছে এদিন। হাউস অব লর্ডসে আটকে যাওয়ার পরে বিল ফেরত যায় হাউস অব কমন্সে। দুই কক্ষে পাশ হলে তা আইনে পরিণত হ'ত।

● **আয়ারল্যান্ডে গর্ভপাত বিরোধী আইন বাতিলে গণভোট :**

১৯৮৩ সালের অষ্টম সাংবিধানিক সংশোধনী অনুযায়ী মা ও গর্ভস্থ শিশু, দু'জনেরই বাঁচার সমান অধিকার রয়েছে। তাই কেউ গর্ভপাত করালে ১৪ বছর পর্যন্ত জেল ও জরিমানা হতে পারে। এর ফলে গর্ভস্থ শিশুর ভয়াবহ অসুস্থতা বা অস্বাভাবিকতা কিংবা অন্তঃসত্বা মহিলার মৃত্যুর আশঙ্কা থাকলেও গর্ভপাতের অনুমতি মেলে না এদেশে। এমনকি ধর্ষণের কারণে অন্তঃসত্বা হয়ে পড়লেও গর্ভপাত করতে দেওয়া হয় না আয়ারল্যান্ডে। দীর্ঘ আন্দোলনের পরে সংবিধানের অষ্টম সংশোধনী বাতিল করার দাবিতে গণভোটের আয়োজন হয়েছিল গত ২৬ মে। বিপুল ভোটে জিতলেন হ্যাঁ-পন্থীরা। তারা পেলেন ৬৬.৪০ শতাংশ ভোট আর 'না'-পন্থীরা পেলেন মাত্র ৩৩.৬০ শতাংশ। ১৯৮৩-র সেই আইন ২০১৮-তে বদলাবে কি না, তা জানতে আরও অপেক্ষা বাকি। গণভোটে হ্যাঁ-পন্থীরা জিতলেও পার্লামেন্টের উচ্চ ও নিম্ন কক্ষ ছাড়পত্র না দেওয়া পর্যন্ত বেআইনিই থাকবে গর্ভপাত। প্রসঙ্গত গর্ভপাত বিরোধী আইন বদলানোর এই জোরদার দাবির নেপথ্যে রয়েছে ২০১২ সালে গর্ভপাতের অভাবে ভারতীয় চিকিৎসক সবিতা হলপ্পনবারের মৃত্যু।

● **৯২ বছর বয়সে মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী হলেন মহাথির :**

ছ'দশকের রাজ্যপাট দুরমুশ করে ৯২ বছর বয়সে ফের মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী হলেন মহাথির মহম্মদ। বিশ্বের প্রবীণতম রাষ্ট্রনেতা হওয়ার রেকর্ডও গড়লেন। গত ১১ মে রাতেই রাজপ্রাসাদে রাজা পঞ্চম সুলতান মহম্মদের পৌরোহিত্যে চিরাচরিত পোশাকে শপথ নেন মহাথির। ৬০ বছরে এই প্রথম মালয়েশিয়ার ভোটে জয় পেল বিরোধীরা। শাসক দলেরই প্রাক্তন নেতা মহাথির এবছর দল বদলে বিরোধী জোটে নাম লেখান। যদিও রাজনীতিতে সদ্য প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী নাজিব রাজাকের হাতেখড়ি মহাথিরের হাত ধরেই। পরবর্তীকালে সম্পর্কে অবনতি হয়। ১৯৯৩ সালে নিজেই অবসর নিয়েছিলেন মহাথির। কিন্তু ২০১৫ থেকে নাজিবের বিরুদ্ধে বড়ো মাপের দুর্নীতির অভিযোগ ঘনাতে শুরু করার পরেই ফের সরব হন মহাথির।

রাজনৈতিক জীবনের প্রথম ইনিংসে দু'দশকেরও বেশি মালয়েশিয়া শাসন করেছেন মহাথির (১৯৮১-১৯৯৩)। তার হাতেই মালয়েশিয়ার আধুনিকীকরণ হয়। এভাবে তার ফিরে আসাকে অনেকেই উইনস্টন চার্চিলের সঙ্গে তুলনা করছেন। ১৯১৫ সালে গ্যালিপোলি যুদ্ধের জেরে সরকার থেকে সরতে বাধ্য হয়েছিলেন চার্চিল। সেই তিনিই ১৯৪০-এ ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী হন। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আকস্মিকভাবে ১৯৪৫ সালের ভোটে হেরে যান। ১৯৫১-য় ফের প্রধানমন্ত্রী এবং ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত ব্রিটেন শাসন করার পরে শারীরিক অবস্থার অবনতির জন্য পদত্যাগ করেন। ৯১ বছর বয়সে মারা যান চার্চিল। মহাথির দ্বিতীয় ইনিংস শুরুই করছেন ৯২-এ।

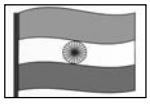

জাতীয়

➢ রেলে খাবারের মান উন্নয়নে হাওড়া-সহ দেশের মোট ৩৫-টি স্টেশনে এবছরেই 'বেস কিচেন' বানানোর সিদ্ধান্ত নিল রেল। এগুলিতে আমিষ ও নিরামিষ রান্নার জন্য থাকছে আলাদা ব্যবস্থা। বদলে ফেলা হচ্ছে 'প্যান্ট্রি' কামরার ডিজাইন। বদলাচ্ছে খাবারের মেনুও। রেল বোর্ড সূত্রে জানানো হয়েছে, প্রথমেই বদলানো হচ্ছে খাবারের তালিকা। আগামী দিনে ভাত বা রুটির সঙ্গে একাধিক পদের বদলে একটি আমিষ বা নিরামিথ পদই দেওয়া হবে পরিমাণে বেশি করে। রুটি/পুরির সঙ্গে সব্জি, ভাতের সঙ্গে মাছ বা ডিমের ঝোল কিংবা রাজমা। সেই খাবার টাটকা ও গরম অবস্থায় পরিবেশন করতেই হাওড়া, রায়পুর, বিলাসপুর, কানপুরের মতো ৩৫-টি গুরুত্বপূর্ণ স্টেশনে গড়া হবে রান্নাঘর। ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক কেন্দ্রীয়ভাবে সিসিটিভি-তে নজরদারি চালাবেন রান্নাঘরের উপরে।

● **শেখ হাসিনার ভারত সফর :**

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গত ২৫-২৬ মে আসেন ভারত সফরে। শান্তিনিকেতনে গিয়ে 'বাংলাদেশ ভবন' উদ্বোধন করেন। ২৫ কোটি টাকা খরচ করে ভবনটি নির্মাণ করেছে বাংলাদেশ। বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে আচার্য নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে এক মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন হাসিনা। মধ্যাহ্নভোজের সময় বৈঠকও হয় দু'জনের মধ্যে। পরদিন বর্ধমানের চুরুলিয়ায় কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ সাম্মানিক ডিগ্রি নেন হাসিনা। উল্লেখ্য, এর আগে লন্ডনে কমনওয়েলথ বৈঠকের ফাঁকে মুখোমুখি কথা হয়েছিল এই দুই রাষ্ট্রপ্রধানের আর দুই রাষ্ট্রপ্রধানের মধ্যে হাসিনাই শেষবার ভারত সফরে এসেছিলেন।

● **মাঝ আকাশের ফোনে সায় টেলি কমিশনের :**

অবশেষে ভারতের আকাশেও বিমান থেকে ফোন করা বা মোবাইল ইন্টারনেট ব্যবহারের সুবিধা মিলতে চলেছে। ট্রাইয়ের সুপারিশ মেনে

গত পয়লা মে সেই প্রস্তাবে সায় দিয়েছে টেলিকম কমিশন। এবার কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সায়ের অপেক্ষা। বহু আন্তর্জাতিক উড়ানে এখন এই পরিষেবা পাওয়া যায়। কিন্তু নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার আশঙ্কায় এবং এ নিয়ে নীতির অভাবে ভারতের আকাশে তা মিলত না। টেলিকম দপ্তর (ডট) ট্রাইয়ের কাছে এই বিষয়ে মতামত চেয়েছিল। জানুয়ারিতে তাতে প্রাথমিক ছাড়পত্র দেয় ট্রাই। তারা জানায়, যথাযথ নিরাপত্তা ব্যবস্থা তৈরির পরে ন্যূনতম ৩,০০০ মিটার উচ্চতায় ওড়া বিমানে এই পরিষেবা চালু করা উচিত। উল্লেখ্য, মাটি ছেড়ে আকাশে ওড়ার চার-পাঁচ মিনিটের মধ্যে বিমান সেই উচ্চতায় পৌঁছয়। আকাশপথের পাশাপাশি এই সিদ্ধান্তে ভারতের জলসীমার মধ্যে থাকা জাহাজেও মোবাইল পরিষেবা চালু হবে বলে এদিন জানান টেলিকম সচিব।

বিদেশের আকাশে স্যাটেলাইটের মাধ্যমে মোবাইল পরিষেবার সুযোগ মেলে। যাত্রী তার ক্রেডিট কার্ড দিয়ে বিমানে থাকা স্যাটেলাইট ফোন ব্যবহার করতে পারেন। অথবা বিমানের স্যাটেলাইট ভিত্তিক ওয়াই-ফাই পরিষেবার মাধ্যমে নিজের ফোনে নেট ব্যবহার বা হোয়াটসঅ্যাপ-কল করতে পারেন। এবার ভারতেও সেই পথ খুলতে চলেছে। তবে কী কী সুবিধা মিলবে, তা আগামী দিনে স্পষ্ট হবে।

● **প্রবীণ নাগরিকদের কল্যাণমূলক আইনে সংশোধনীর খসড়া :**

প্রবীণ নাগরিকদের স্বার্থরক্ষায় আরও কড়া আইন আনতে চলেছে কেন্দ্র। ষাট বছর এবং তার চেয়ে বেশি বয়সের বাবা-মায়ের উপরে অত্যাচার অথবা তাদের যত্নের ব্যাপারে কোনও অবহেলা করলে আগামী দিনে আরও কড়া শাস্তির মুখে পড়তে হতে পারে সন্তানদের। আগে এর সাজা ছিল তিন মাস জেল। সেটাই ছ'মাস করার প্রস্তাব দিয়েছে কেন্দ্র। বাবা-মা, প্রবীণ নাগরিকদের দেখভাল ও কল্যাণমূলক আইনে এই সংক্রান্ত সংশোধনীর খসড়া ইতোমধ্যেই তৈরি করে ফেলেছে সামাজিক ন্যায় মন্ত্রক। সংসদে এই বিল পাশ হলে দেশের প্রতি জেলায় অন্তত একটি সিনিয়র সিটিজেন কেয়ার হোম চালু করার প্রস্তাব রাখা হয়েছে। বিলে থাকছে, সম্পত্তি হস্তান্তরের পরে আইনি উত্তরাধিকারী যদি বাবা-মায়ের দেখভাল না করেন, সেক্ষেত্রে বিষয়টিকে প্রতারণা হিসেবে ধরা হবে। যার ফলে ট্রাইব্যুনাল সম্পত্তি ফিরিয়ে দিতে পারে বাবা-মাকে। এছাড়া সরকারি ও বেসরকারি বিমা, স্বাস্থ্য, বাড়ি, ভ্রমণ প্রকল্পে প্রবীণ নাগরিকদের বয়ঃসীমা ৬০ বছর করার প্রস্তাব রয়েছে ওই খসড়া বিলে।

বদল আসছে সন্তানের সংজ্ঞাতে। দত্তক সন্তান ও সৎ ছেলে-মেয়েও সন্তান হিসেবে গণ্য হবেন। এমনকি জামাই, বৌমা, নাতি, নাতনিরাও পড়বেন সন্তানের তালিকায়। পরিবর্তন হচ্ছে দেখভালের সংজ্ঞায়। খাবার, জামাকাপড়, চিকিৎসা, সুরক্ষা, থাকার ব্যবস্থা—সবই যুক্ত করা হচ্ছে সেখানে। নিঃসন্তান দম্পতিদের আত্মীয়ের তালিকায় যুক্ত হচ্ছে তাদের সম্পত্তির উত্তরাধিকারীকে। তবে এর মধ্য ধরা হবে না নাবালকদের। সন্তানেরা দেখভাল না করলে প্রবীণেরা যাতে নির্দিষ্ট ট্রাইব্যুনালের দ্বারস্থ হতে পারেন, সেই ব্যবস্থা রাখা হচ্ছে খসড়া আইনে। সেক্ষেত্রে ট্রাইব্যুনাল অভিযোগ খতিয়ে বাবা-মায়ের কাছে প্রতি মাসে নির্দিষ্ট অঙ্কের টাকা পাঠানোর নির্দেশ দেবে সন্তানদের। নিঃসন্তান দম্পতিদের ক্ষেত্রে ওই নির্দেশ দেওয়া হবে নিকটতম আত্মীয়দের। টাকার অঙ্ক ঠিক হবে বাবা-মায়ের জীবনযাত্রা ও দু'তরফের আর্থিক অবস্থার উপরে ভিত্তি করে। দেখভালের মাসিক অর্থ দিতে ব্যর্থ হলে শাস্তি এক মাসের জেল। বর্তমানে দেখভালের অঙ্ক প্রতি মাসে সর্বোচ্চ ১০ হাজার টাকা।

● **আধার মামলায় শুনানি শেষ, রায় স্থগিত রাখল সুপ্রিম কোর্ট :**

আধার আইনের সাংবিধানিক বৈধতাকে চ্যালেঞ্জ করে যে আবেদন জমা পড়েছিল, গত ১১ মে তা নিয়ে রায় স্থগিত রাখল সুপ্রিম কোর্ট। অ্যাটর্নি জেনারেল কে. কে. বেণুগোপাল এই সিদ্ধান্ত জানানোর সময়ে বলেছেন, শীর্ষ আদালতের ইতিহাসে এটিই সবচেয়ে দীর্ঘ শুনানি। জানুয়ারি থেকে শুরু করে গত চার মাসে মোট ৩৮ দিন আধার নিয়ে শুনানি চলেছে। এর আগে ১৯৭০ সালে কেশবানন্দ ভারতী মামলায় সবচেয়ে বেশি দিন শুনানি হয়েছিল। আধারের এই মামলার শুনানিতে সুপ্রিম কোর্টের বেঞ্চে আছেন বিচারপতি এ. কে. সিক্রি, বিচারপতি এ. এম. খানউইলকর, বিচারপতি অশোক ভূষণ ও বিচারপতি ডি. ওয়াই. চন্দ্রচূড়।

● **এভারেস্ট শীর্ষে অরুণাচলের মুরি লিঙ্গি :**

চার কন্যার মধ্যে বড়ো জন সদ্য উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করেছে। এই বয়সে আর পাঁচজন মহিলা যখন সংসার সামলাতেই ব্যস্ত, তখনই চল্লিশোর্ধ্ব মুরি লিঙ্গি পিঠে রুকস্যাক, পায়ে কাঁটার জুতো, হাতে তুষার-গাঁইতি নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন শীর্ষতম শিখরের পথে। অরুণাচলের লোয়ার দিবাং ভ্যালি উপত্যকার রোয়িংয়ের বাড়ি থেকে কাঠমাণ্ডুর উদ্দেশ্যে রওনা দেন ৭ এপ্রিল। এক মাস ছয় দিনের মাথায় সেই মহিলাই এভারেস্ট শিখরে। রোয়িংয়ের বাসিন্দা মুরি রাজ্যে 'বেটি বাঁচাও, বেটি পড়াও' অভিযানের অন্যতম উজ্জ্বল মুখ। সেই তিনিই এবার নিজের মেয়েদের ও গোটা রাজ্যের মুখ উজ্জ্বল করলেন। রাজ্য তথা উত্তর-পূর্বের প্রথম এভারেস্টজয়ী মহিলা তিনে মেনা ও পাঁচবারের 'এভারেস্ট বিজয়িনী' আনসু জামসেনপার পরে অরুণাচলের তৃতীয় মহিলা হিসেবে এভারেস্ট আরোহণের কৃতিত্ব অর্জন করলেন মুরি।

তিনে মেনাকে দেখেই ২০১৩ সাল থেকে তার পাহাড় চড়া শুরু। মেনার সঙ্গেই পা মিলিয়ে তিনি প্রথমে আনিনি থেকে মালিনি পর্যন্ত অভিযানে যান। এর পর মেনার সঙ্গী হয়ে হিমাচলের মেনথোসা শৃঙ্গ আরোহণ করেন। 'নিমাস' ও দার্জিলিংয়ের এইচএমআই থেকে পর্বতারোহণের অ্যাডভান্স কোর্স সেরে ২০১৬ সালে বমডিলার মেয়ে আনসু জানসেমপার সঙ্গে ৬২২২ মিটার উঁচু গোরিচেন অভিযানে যান মুরি। তারপরেই লক্ষ্য স্থির করেন, এভারেস্ট। তার অভিযানে রাজ্য সরকার ১০ লক্ষ টাকা দিয়েছে। বাকি ১০ লক্ষ টাকা দিয়েছে এনএইচপিসি, সাংসদ মুকুট মিথি ও বিভিন্ন সংগঠন। ১২ এপ্রিল লুকলা থেকে যাত্রা শুরু করে ২০ এপ্রিল তিনি বেস ক্যাম্পে পৌঁছন। কিন্তু বাধা হয়ে দাঁড়ায় প্রতিকূল আবহাওয়া। ১০ মে রাত ১টা নাগাদ শীর্ষারোহণের শেষ চড়াই শুরু করেন তিনি। সাধারণত ওই পথ পার করতে পাঁচ দিন লাগে। কিন্তু রাতেও হাঁটা না থামিয়ে এভারেস্টের মাথায় ভারতের পতাকা ওড়ান ১৪ মে, সকাল ৮টায়।

● **দেশের সবচেয়ে পরিচ্ছন্ন শহর আবার ইন্দোর :**

গত বছরের মতো চলতি বছরেও দেশের সবচেয়ে পরিচ্ছন্ন শহর হিসেবে উঠে এল ইন্দোরের নাম। 'স্বচ্ছ ভারত অভিযান'-এর অঙ্গ হিসেবে গত কয়েক বছর ধরেই কোয়ালিটি কাউন্সিল অব ইন্ডিয়া 'স্বচ্ছ সর্বেক্ষণ' সমীক্ষা চালায় দেশের ৪৩৪-টি শহরে। পরিচ্ছন্নতার নিরিখে শহরগুলির র‍্যাঙ্কিং প্রকাশ করা হয়। সেই র‍্যাংঙ্কিংয়ে চলতি বছরেও শীর্ষ স্থানে রয়েছে ইন্দোর। দ্বিতীয় স্থানে ভোপাল ও তৃতীয় চণ্ডীগড়। প্রসঙ্গত, ইন্দোরের নব দম্পতিরা সাত পাকে নয়, বরং বাঁধা পড়েন আট

উপনির্বাচনের ফলাফল

গত ২৮ মে দেশের ১০ রাজ্যে ৪-টি লোকসভা কেন্দ্রে এবং ১০-টি বিধানসভা কেন্দ্রে উপনির্বাচন হয়। এছাড়া কর্ণাটকে একটি আসনে, বাকি থাকা বিধানসভা ভোটও হয় ওই দিন। ভোট গণনা হয় ৩১ মে। এক নজরে দেখা যাক বিভিন্ন আসনের ফলাফল : ● পশ্চিবঙ্গের মহেশতলায় ৬২,৩২৪ ভোটে জিতল তৃণমূল। দ্বিতীয় স্থানে বিজেপি। তিনে সিপিএম। ● উত্তরপ্রদেশের কৈরানা লোকসভা কেন্দ্রে বিজেপি-কে হারিয়ে দিল আরএলডি। আসনটি বিজেপি-র ছিল। কংগ্রেস, এসপি, বিএসপি সমর্থিত আরএলডি প্রার্থী তবস্মুম হাসান জিতলেন ৫৫ হাজারের বেশি ভোটে। ● মহারাষ্ট্রের পালঘর লোকসভা আসনে ২৯,৫৭২ ভোটে জিতল বিজেপি। আসনটি বিজেপি-রই ছিল। ● কেরালার চেঙানুরে ২০৯৫৬ ভোটে জয়ী সিপিএম প্রার্থী। ● বিহারের জোকিহাটে ৪১,২২৪ ভোটে জয়ী আরজেডি প্রার্থী শাহানওয়াজ। আসনটি ছিল বিজেপি-র জোটসঙ্গী জেডিইউ-এর। ● উত্তরপ্রদেশে নুরপুরে জিতল সমাজবাদী পার্টি। জয় এল ৬,২১১ ভোটে। এই আসন বিজেপি-র ছিল। ● পাঞ্জাবের শাহকোটে জিতল কংগ্রেস। এটি ছিল বিজেপি-র জোটসঙ্গী শিরোমণি অকালি দলের। ● কর্ণাটকের রাজ রাজেশ্বরী নগরে বাকি থাকা বিধানসভা নির্বাচনে জিতল কংগ্রেস। বিজেপি-র সঙ্গে ব্যবধান ৪১,১৬২। ● উত্তরাখণ্ডের থারালি বিধানসভা কেন্দ্রে ১৯০০ ভোটে জিতল বিজেপি। আসন বিজেপি-রই ছিল। ● মেঘালয়ের আমপাতি বিধানসভা কেন্দ্রে জয়ী কংগ্রেস প্রার্থী মিয়ানি ডি' শিরা। ● ঝাড়খণ্ডের গোমিয়া বিধানসভা কেন্দ্রে জয়ী জেএমএম। ● মহারাষ্ট্রের পালুস-কাড়েগাঁও বিধানসভা কেন্দ্রে জয়ী কংগ্রেস প্রার্থী বিশ্বজিৎ পতঙ্গরাও। ● মহারাষ্ট্রের ভাণ্ডারা গোণ্ডিয়া লোকসভা আসনে জিতল এনসিপি। আসনটি বিজেপি-র ছিল। ● নাগাল্যান্ডের একমাত্র লোকসভা আসনটি জিতে নেয় বিজেপি-র জোটসঙ্গী এনডিপিপি।

পাকে—শেষবারে তাদের শপথ নিতে হয় শহর পরিষ্কার রাখার। বিয়ের অনুষ্ঠানে আত্মীয়, বন্ধুদের মধ্যে ডাস্টবিন বিলি করা হয়।

শহর পরিচ্ছন্নতায় এগিয়ে থাকলেও নাগরিকদের একটা অংশের মধ্যে যত্রতত্র আবর্জনা ফেলার অভ্যাস রয়ে গিয়েছিল। এই অভ্যাস বদলাতে প্রতিদিন বাড়ি বাড়ি গিয়ে আবর্জনা সংগ্রহ করে আনার দায়িত্ব নিয়েছেন পুরকর্মীরা। সেই কাজে তাদের সহযোগিতা করেন শহরবাসী। শহরকে আবর্জনা মুক্ত রাখার অন্য পন্থাও খুঁজে নিয়েছেন নাগরিকেরা। ইন্দোরের লোকমান্য নগরের ৭৫০-টি পরিবারের লোকজন আবর্জনা থেকে সার তৈরির ব্যবসা শুরু করেছেন। একই প্রয়াস দেখা গিয়েছে ইন্দোরের বাকি কয়েকটি জায়গাতেও। সেখানকার নাগরিকরা নিজেরাই আবর্জনা সংগ্রহ করে সার বানিয়ে নানা জায়গায় সরবরাহ করেন। প্লাস্টিক দূষণ রোধে জায়গায় অভিযান চালাচ্ছে পুরসভা। ইন্দোরের নাগরিকেরাও দেখিয়ে দিয়েছেন প্লাস্টিক দূরীকরণে তারা সক্রিয়। দোকান, বাজার সর্বত্র প্লাস্টিকের ক্যারিব্যাগ এড়িয়ে চলেন তারা। রাস্তাঘাটে আবর্জনা, পানের পিক, থুতু ফেলা বন্ধ করতে এক অভিনব পন্থা নিয়েছে ইন্দোরের পুরসভা। নাগরিকেরা তাদের গাড়িতে সবসময় ডাস্টবিন রেখে দেন। রাস্তায় না ফেলে সেখানেই যাবতীয় আবর্জনা জমা করেন তারা। পথচলতি মানুষও নিজের সঙ্গে সেরকমই বিকল্প ব্যবস্থা রাখেন। দূষণমুক্ত শহর গড়ে তোলার প্রয়াস শুধু প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে নয়, শিশুদের মধ্যেও দেখা গিয়েছে। স্কুলে, বাড়িতে বাচ্চাদের নিয়ম করে সচেতনতার পাঠ দেওয়া হয়। পুরসভার কর্মীরা ছাড়াও শহর পরিষ্কার রাখার দায়িত্বে শামিল করা হয়েছে স্কুলপড়ুয়াদেরও। মিটিং, মিছিল বা যেকোনও ধর্মীয় অনুষ্ঠানের পরে পুরকর্মীরা ছাড়াও শহর পরিষ্কারের কাজে হাত লাগান শহরবাসীরা। এই প্রয়াস দেশের অন্যান্য শহরে সাধারণত দেখা যায় না।

● **কর্ণাটকের নতুন মুখ্যমন্ত্রী :**

কর্ণাটক বিধানসভায় মোট আসন সংখ্যা ২২৪। গত ১২ মে ২২২-টি আসনের জন্য ভোট গ্রহণ হয়। গণনা হয় ১৫ মে। কয়েক দিনের জন্য মুখ্যমন্ত্রীর পদে আসীন ছিলেন শিকারিপুরার বিজেপি বিধায়ক বি এস ইয়েদুরাপ্পা। এর পর, ২৩ মে তার স্থলাভিষিক্ত হন চান্নাপাটনার জনতা দল (সেকুলার)-এর বিধায়ক এইচ ডি কুমারস্বামী। উপমুখ্যমন্ত্রী তার জোটসঙ্গী কংগ্রেসের ড. জি পরমেশ্বর।

পশ্চিমবঙ্গ

- নবীন থেকে প্রবীণ, অধিকাংশের কাছেই সোশ্যাল মিডিয়া এখন বেশ জনপ্রিয়। কিন্তু অনেক সময়েই এর ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে স্কুলপড়ুয়া, শিক্ষক-শিক্ষিকাদের উপরেও। তাই সাইবার অপরাধ সম্পর্কে সকলকে সচেতন করতে উদ্যোগী হচ্ছে স্কুলশিক্ষা দপ্তর। কলকাতায় কর্মশালা হয়েছে। এরপর জেলায় জেলায় কর্মশালা করতে চাইছে ওই দপ্তর। প্রাথমিকভাবে সাইবার দুনিয়া সম্পর্কে সতর্ক থাকার জন্য স্কুলশিক্ষা দপ্তরের ওয়েবসাইটে বেশ কয়েক দফা পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। সাইবার অপরাধ থেকে কীভাবে বাঁচতে হয়, কর্মশালায় তার প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। বিশেষ করে বিভিন্ন মারণ খেলায় জড়িয়ে পড়ার প্রবণতা থেকে ছাত্রছাত্রীদের রক্ষা করার জন্য খুঁটিনাটি জানা প্রয়োজন। জেলার বাছাই করা কয়েকটি স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকা, পড়ুয়া নিয়ে এক-একটি দল গড়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। প্রশিক্ষণ শেষে সেই দলের সদস্যেরাই গোটা জেলায় শিক্ষক-পড়ুয়াদের সাইবার অপরাধ সম্পর্কে সচেতন করবেন।
- কর্মসংস্থানের তাগিদে শিল্পের সঙ্গে শিক্ষার সমন্বয় জোরদার করা যে দরকার, শিক্ষা ও শিল্প দুই শিবিরেই সেই বিষয়ে একমত। এই অবস্থায় রাজ্যের বেসরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজগুলিতে ২০১৮-'১৯ শিক্ষাবর্ষ থেকেই বৃত্তিমূলক পাঠ্যক্রম চালু করতে উদ্যোগী হয়েছে মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ইউনিভার্সিটি অব টেকনোলজি (ম্যাকাউট)। এই বিষয়ে একটি কমিটিও গড়া হয়েছে। কোন কলেজে কোন কোন বিষয়ের পঠনপাঠন চালু করা যেতে পারে, তার পরিকাঠামো কতটা কী আছে, সেখানকার পাঠ্যক্রম সম্পূর্ণ করে পড়ুয়ার চাকরি পাওয়ার সম্ভাবনা কতটা, শিল্প ক্ষেত্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কলেজের যোগাযোগ—এইসব বিষয় খতিয়ে দেখবে ওই কমিটি। বৃত্তিশিক্ষার এই পাঠ্যক্রম (বি ভোক) হবে তিন বছরের। দ্বাদশ শ্রেণি উত্তীর্ণ পড়ুয়ারা এইসব কোর্সে ভর্তির সুযোগ পাবেন। যেসব ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ বৃত্তিমূলক পাঠ্যক্রম চালু করতে আগ্রহী, সম্প্রতি অল ইন্ডিয়া কাউন্সিল ফর টেকনিক্যাল এডুকেশন (এআইসিটিই) তাদের সম্মতি দিতে শুরু করেছে।
- গত ২১ মে বঙ্গ সম্মানের মঞ্চে প্রবীণ সঙ্গীতশিল্পী আশা ভোঁসলকে সম্মান প্রদান করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এবারের

বঙ্গবিভূষণ প্রাপকদের মধ্যে আশা ভোঁসলে ছাড়া ছিলেন, রাজবংশী ভাষা-সংস্কৃতির গবেষক-লেখক গিরিজাশঙ্কর রায় এবং সাঁওতালি ভাষা-সংস্কৃতি চর্চার গুরুত্বপূর্ণ মুখ সুহৃদকুমার ভৌমিক। একই সঙ্গে সাহিত্যিক সমরেশ মজুমদার, বিনোদন জগতের প্রসেনজিৎ, ফুটবলজগতের হায়দরাবাদবাসী মহম্মদ হাবিব ও সুব্রত ভট্টাচার্য, প্রাক্তন বিচারপতি শ্যামল সেন প্রমুখ সম্মানিত হয়েছেন। বাচিকশিল্পী পার্থ ঘোষ, সঙ্গীতশিল্পী শ্রীরাধা বন্দ্যোপাধ্যায়, অরুন্ধতী হোম চৌধুরীরা পেয়েছেন বঙ্গভূষণ সম্মান।

➢ প্রাথমিক ও উচ্চ প্রাথমিক স্তরে পঠনপাঠনের ত্রুটি খুঁজে বার করতে পর্যালোচনা শুরু করল স্কুলশিক্ষা দপ্তর। পর্যালোচনার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে স্টেট কাউন্সিল ফর এডুকেশনাল রিসার্চ অ্যান্ড ট্রেনিং-কে (এসসিইআরটি)। জুন মাসে রাজ্য সরকারের কাছে এই সংক্রান্ত রিপোর্ট পেশ করার কথা এসসিউআরটি-র তৈরি এক বিশেষজ্ঞ কমিটির। সম্প্রতি সারা দেশে তৃতীয়, পঞ্চম ও অষ্টম শ্রেণির পড়ুয়াদের নিয়ে এক সমীক্ষা করা হয়, ওই সমীক্ষায় এই রাজ্যের ফল আশাব্যঞ্জক হয়নি। কেন খারাপ ফল হল রাজ্যের, তা জানতে উদ্যোগী রাজ্য সরকার। সেই কাজের দায়িত্বই দেওয়া হয়েছে এসসিইআরটি-কে। প্রসঙ্গত, ২০১৩ সালে স্কুল স্তরে নতুন পাঠ্যক্রম চালু হয়েছিল।

● **জিএসটি-তে রাজ্যের রাজস্ব বৃদ্ধি :**

জিএসটি ব্যবস্থা চালুর ১১ মাসের মাথায় হাতে আসা তথ্যে স্পষ্ট যে, ভ্যাট জমানার তুলনায় এরাজ্যে জিএসটি-র আওতায় কর আদায় বেড়েছে প্রায় ১৪ শতাংশ। গত ২৮ মে এমসিসি চেম্বার অব কমার্সের জিএসটি নিয়ে এক সভায় একথা জানালেন সেন্ট্রাল জিএসটি-র হলদিয়া কমিশনারেটের কমিশনার বিজয় কুমার মল্লিক। তার কথায়, বিহার-সহ কিছু রাজ্যে পণ্য ও পরিষেবা খাতে কর আদায়ের হার আগের বছরের তুলনায় প্রায় ৪০ শতাংশ পর্যন্ত কমেছে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে বেড়েছে ১৪ শতাংশ। ২০১৭ সালের ১ জুলাই সারা দেশে জিএসটি চালুর পরে গত প্রায় এক বছরে এরাজ্যের সংগ্রহ প্রায় ১৫ হাজার কোটি টাকা। শুধু কর আদায়ই নয়, জিএসটি-র আওতায় নাম লেখানোর ক্ষেত্রেও রাজ্যগুলির মধ্যে শীর্ষে পশ্চিমবঙ্গ। রাজ্যে বাণিজ্য কর বিভাগের অতিরিক্ত কমিশনার আদেশ কুমার জানান, এখানে এখনও পর্যন্ত ৬.৫ লক্ষ সংস্থা নথিভুক্ত হয়েছে। পুরনো ব্যবস্থায় তা ছিল ২.৮৬ লক্ষ। উল্লেখ্য, পশ্চিমবঙ্গ-সহ আরও কিছু রাজ্যে ই-ওয়ে বিল চালু আছে। জিএসটি-তে ৫০ হাজার টাকার বেশি মূল্যের পণ্য চলাচলে লাগে এটি। আগামী ৩ জুলাই থেকে বাকি রাজ্যেও ই-ওয়ে বিল চালু হওয়ার কথা।

● **কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে কলা আর বিজ্ঞানেও মিশ্র পাঠে সায় :**

'চয়েস বেসড ক্রেডিট সিস্টেম' (সিবিসিএস) বা পছন্দসই মিশ্র পাঠ চালু করে অকৃতকার্যদের বছর নষ্টের আশঙ্কায় প্রায় দাঁড়ি টেনে দিল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। বাণিজ্য বিভাগে মিশ্র পাঠ চালু হয়েছে আগেই। কলা আর বিজ্ঞান বিভাগেও তা চালু করার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হল সিন্ডিকেটের গত ৭ মে-র বৈঠকে। এই পদ্ধতিতে কোনও সেমেস্টারেই পড়ুয়াদের আটকে রাখা যাবে না। পাশ নম্বর না-পেলেও পরবর্তী কোনও সেমেস্টারে ফের পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ পাবেন পড়ুয়ারা। পছন্দের বিষয় নিজের কলেজে না-থাকলে অন্য কলেজে যাতে পড়া যায়, সেই ব্যবস্থা করার ব্যাপারেও ভাবনাচিন্তা চলছে। নতুন এই পদ্ধতিতে অনার্স পড়ুয়াদের অনার্স পত্রের সঙ্গে পড়তে হবে জেনেরিক ইলেক্টিভ বিষয়। অনার্সের কোন বিষয়ের পাশাপাশি কী কী বিষয় নিয়ে পড়া যাবে, তার জন্য আটটি 'সাবজেক্ট কম্বিনেশন' তৈরি করা হয়েছে। সব বিষয়ের ক্রেডিট সমান নয়। যেমন বাধ্যতামূলক ভাষায় ক্রেডিট দুই হলেও অনার্সের পত্রে ক্রেডিট ছয়। সেই ক্রেডিটের উল্লেখ থাকবে মার্কশিটে। নতুন পাঠ-ব্যবস্থায় নম্বর তোলা অনেকটা সহজ হবে বলেই শিক্ষা শিবিরের অভিমত। কারণ, প্রতিটি বিষয়ে ২০ নম্বর (হাজিরায় ১০ এবং অভ্যন্তরীণ মূল্যায়নে ১০) কলেজের হাতে থাকছে এবং তা পাওয়া প্রায় নিশ্চিত। বাকি ৩০ নম্বর প্র্যাক্টিকাল এবং ৫০ নম্বর লিখিত 'থিয়োরি' পরীক্ষা। যেসব বিষয়ের প্র্যাক্টিকাল নেই, সেগুলোর ক্ষেত্রে 'টিউটোরিয়াল'-এ থাকছে ১৫ নম্বর। সেই সব বিষয়ে লিখিত পরীক্ষা ৬৫ নম্বরের।

● **সরকারি স্কুলে যৌন নিগ্রহের তদন্তে কমিটি :**

পড়ুয়াদের সুরক্ষার জন্য প্রতিটি স্কুলে কমিটি গঠনের নির্দেশ আগেই দিয়েছিল স্কুলশিক্ষা দপ্তর। এবার সব স্কুলে শিক্ষিকা, মহিলা অভিভাবক, মহিলা শিক্ষাকর্মী ও পড়ুয়াদের যৌন নিগ্রহের অভিযোগ জানানোর জন্য বিশেষ কমিটি গঠনের নির্দেশ দিল তারা। ৩১ মে-র মধ্যে কমিটি গঠনের বিস্তারিত রিপোর্ট চেয়ে পাঠায় দপ্তর। কর্মক্ষেত্রে কোনও মহিলা যৌন নিগ্রহের শিকার হলে বিশাখা নির্দেশিকা মেনে তারা অভিযোগ জানাতে পারেন। কিন্তু এতদিন রাজ্যের কোনও স্কুলে অভিযোগ জানানোর সংস্থানই ছিল না বলে অভিযোগ শিক্ষিকাদের। বহু স্কুলে এই ধরনের অভিযোগ জানাতে হয় ডিআই অফিসে। কিন্তু জেলার কয়েক হাজার স্কুলের দায়িত্বপ্রাপ্ত ডিআই-এর পক্ষে যৌন নিগ্রহের অভিযোগের দ্রুত তদন্ত সম্ভব হচ্ছিল না। সেকথা মাথায় রেখেই দপ্তর এই পদক্ষেপ করেছে বলে মনে করছে শিক্ষামহল। দপ্তর নির্দেশ দিয়েছে, রাজ্যের সমস্ত সরকার পোষিত ও সাহায্যপ্রাপ্ত প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলে অভিযোগ জানানোর কমিটি তৈরি করতে হবে। পাঁচ সদস্যের কমিটিতে থাকবেন ওই স্কুলের শিক্ষিকা ও মহিলা শিক্ষাকর্মীরা। যদি স্কুলে কোনও শিক্ষিকা না থাকেন, তাহলে মহিলা অভিভাবক, আশেপাশের কোনও স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা অথবা কোনও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার মহিলা কর্মীকে নিয়ে কমিটি গঠন করতে হবে। ওই কমিটিতে ছাত্রছাত্রী নির্বিশেষে যেকোনও পড়ুয়া অভিযোগ জানাতে পারবেন।

● **সর্বশিক্ষা মিশনের 'টুইনিং অব স্কুলস' প্রকল্প :**

আত্মকেন্দ্রিকতা ও হীনমন্যতা দূর করে স্কুলপড়ুয়ারা যাতে যথার্থ অর্থে সামাজিক হয়ে উঠতে পারে, সেজন্য উদ্যোগী হল কলকাতার সর্বশিক্ষা মিশন। এই উদ্দেশ্যে কলকাতা পুরসভার ১৫-টি বরোর মোট ৩০-টি সরকারি ও সরকার পোষিত স্কুলের সপ্তম অথবা অষ্টম শ্রেণির পড়ুয়াদের একসঙ্গে করে শিক্ষা দেওয়ার কাজ শুরু হয়েছে। তবে তা চার দেওয়ালের মধ্যেই শুধু নয়, শহরের বিভিন্ন এলাকা ঘুরে ওই পড়ুয়াদের সঙ্গে সমাজের সরাসরি পরিচয় ঘটাতে উদ্যোগী হয়েছে সর্বশিক্ষা মিশন। প্রকল্পটির নাম দেওয়া হয়েছে 'টুইনিং অব স্কুলস'। প্রথমে ১৫-টি বরোর প্রতিটি থেকে দু'টি করে মোট ৩০-টি স্কুলকে চিহ্নিত করা হয়েছে। এর পরে প্রতিটি স্কুলের সপ্তম বা অষ্টম শ্রেণির ৩০ জন পড়ুয়াকে নিয়ে মোট ৬০ জনের একটি দল গঠন করা হয়েছে। যাদের মধ্যে রয়েছে মেধাবী, পিছিয়ে পড়া এবং স্কুলছুট পড়ুয়ারাও। পরবর্তী পর্যায়ে বেছে নেওয়া হচ্ছে নির্দিষ্ট একটি সপ্তাহ। সপ্তাহের তিন দিন ওই

৬০ জন পড়ুয়াকে দু'টি স্কুলেই নিয়ে যাবেন শিক্ষকেরা। পাশাপাশি, তাদের নিয়ে এলাকা পরিদর্শন করবেন তাঁরা। পরিচয় করিয়ে দেবেন স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে। যে এলাকার যে বিশেষত্ব, তার সঙ্গে ছাত্রছাত্রীদের সরাসরি যোগাযোগ করানোর দায়িত্ব থাকছে শিক্ষক ও সর্বশিক্ষা মিশনের আধিকারিকদের উপরে।

● **ব্রেলে লেখা দেশের প্রথম ভোটার্স স্লিপ :**

মহেশতলায় ৩০-এর বেশি দৃষ্টিহীন ভোটারের হাতে 'অথেনটিকেটেড ফোটো ভোটার্স স্লিপ'। সেই 'স্লিপে' আছে ব্রেল পদ্ধতি ব্যবহারের সুবিধা। কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশন সূত্রের দাবি, দেশের মধ্যে এটাই প্রথম। 'ভোটার্স স্লিপে' সংশ্লিষ্ট বুথ নম্বর, ভোটার তালিকার ক্রমিক সংখ্যা ব্রেলে উল্লেখ করা। যা বুঝে নিতে পারবেন সংশ্লিষ্ট দৃষ্টিহীন ব্যক্তি। নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তরের কর্তাদের মতে, মহেশতলা উপনির্বাচনে 'পাইলট প্রোজেক্ট' হিসেবে এটা শুরু করার নির্দেশ দেয় কমিশন। গত ২৫ মে শেষ হয় 'ভোটার্স স্লিপ' বিতরণের কাজ। ইভিএম-এ ব্রেল পদ্ধতি ব্যবহার করে ভোট দিতে পারেন দৃষ্টিহীনেরা। আর এবার তারা কীভাবে ভোট দেবেন, সেই সংক্রান্ত ভিনাইল বোর্ডেও ছিল ব্রেল পদ্ধতি। মহেশতলা বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনে তা ব্যবহারের জন্য রাজ্য মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক (সিইও) দপ্তরকে নির্দেশ দেয় কমিশন। প্রসঙ্গত, এই উপ-নির্বাচনে জয়ী হয়েছেন শাসক দলের প্রার্থী দুলাল চন্দ্র দাস।

● **রাজ্যে শ্রম আইন লঙ্ঘন রুখতে উদ্যোগ :**

রাজ্যে শ্রম আইন ভাঙার প্রবণতা কমানোর লক্ষ্যে কোমর বেঁধেছে সরকার। সেজন্য বিভিন্ন সংস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য জোগাড় করতে উদ্যোগী হয়েছে শ্রম দপ্তর। সম্প্রতি ঠিকা শ্রমিক নিয়োগ নিয়ে বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্স আয়োজিত এক সভায় রাজ্যের শ্রম কমিশনার জাভেদ আখতার বলেন, ঠিকা শ্রমিক (কন্ট্রাক্ট লেবার) নিয়োগ করার ক্ষেত্রে মূল নিয়োগকারী এবং ঠিকাদারের নথিভুক্তিকরণের জন্য তারা ইতোমধ্যেই অনলাইন ব্যবস্থা চালু করেছেন। কোন সংস্থা কোথায়, কীভাবে, কতটা শ্রম আইন ভাঙছে কিংবা কারা তা মেনে চলছে, এবার তা নথিবদ্ধ করে রাখার ব্যবস্থাও নেওয়া হচ্ছে। সভায় উপস্থিত রাজ্যের অতিরিক্ত শ্রম কমিশনার রীনা তারগেন জানান, কোন সংস্থা শ্রম আইন কতটা ভাঙছে বা মেনে চলছে তা যাচাই করার জন্য তথ্য সংগ্রহের কাজ শুরু করেছে শ্রম দপ্তর। প্রধানত প্রভিডেন্ট ফান্ড, ইএসআই এবং শ্রমিক সংগঠনের কাছ থেকে ওইসব তথ্য জোগাড় করা হচ্ছে। যাতে সেই তথ্যভাণ্ডার খতিয়ে দেখলেই বোঝা যায়, কোথায় কতখানি নজরদারি দরকার। সেই অনুযায়ী বিভিন্ন সংস্থা পরিদর্শনও করবেন দপ্তরের আধিকারিকেরা। হাতে আসা বিভিন্ন তথ্যের ভিত্তিতে নিয়োগকারী সংস্থাগুলিকে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করবে দপ্তর। যে সমস্ত সংস্থা সম্পর্কে খারাপ রিপোর্ট পাওয়া যাবে, তাদের উপরেই চালানো হবে বাড়তি নজরদারি। দপ্তরের আধিকারিকেরা সমস্যা সরেজমিনে খতিয়ে দেখতেই সংস্থাগুলির কারখানা বা অফিস পরিদর্শনে যাবেন।

অর্থনীতি

➢ চলতি বছরের প্রথম তিন মাসে (জানুয়ারি-মার্চ) চিনের চলতি খাতে বিদেশি মুদ্রা লেনদেন ঘাটতি দাঁড়িয়েছে ২,৮২০ কোটি ডলার। ১৭ বছরে এই প্রথম ওই ঘাটতির মুখ দেখল বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম এই অর্থনীতি। শেষবার ২০০১ সালের দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকে তা হয়েছিল। গত ৬ মে চিন জানিয়েছে, জানুয়ারি থেকে মার্চে তাদের পরিষেবা ক্ষেত্রে ঘাটতি ৭,৬২০ কোটি ডলার। পণ্য বাণিজ্য উদ্বৃত্ত। কিন্তু তারও পরিমাণ ৩৫ শতাংশ কমে হয়েছে ৫,৩৪০ কোটি ডলার। উল্লেখ্য, ১৭ বছর ধরে বিপুল রপ্তানির জেরে এক সময়ে চিনের বিদেশি মুদ্রা ভাণ্ডার ছাড়িয়েছিল ৪ লক্ষ কোটি ডলার। এখন তা ৩.১৪ লক্ষ কোটি।

➢ ভারত-সহ বিশ্ব জুড়ে কমেছে সোনার চাহিদা। ওয়ার্ল্ড গোল্ড কাউন্সিলের রিপোর্টে বলা হয়েছে, চলতি বছরের প্রথম তিন মাসে সারা বিশ্বে সোনার চাহিদা ৭ শতাংশ কমেছে। আর ভারতে ১২ শতাংশ। চাহিদা কমায় দেশে আমদানিও কমেছে ৫০ শতাংশ। চাহিদা কমার প্রধান কারণ, লগ্নির ক্ষেত্র হিসেবে হলুদ ধাতুটির গুরুত্ব কমা। সোনার দামে তেমন হেরফের না হওয়াই এজন্য দায়ী বলে মনে করছে কাউন্সিল। ভারতে তার সঙ্গে কমেছে সোনার গয়নার চাহিদাও।

➢ পাশে সমুদ্র নেই। তাই পাকিস্তান থেকে চিনি বা অস্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে কয়লা-সহ নেপালে আমদানি করা যাবতীয় পণ্য প্রথমে জাহাজে চেপে আসে কলকাতা বন্দরে। সেখান থেকে ভারতের শুল্ক দপ্তরের ছাড়পত্র পাওয়ার পরে ট্রেনে বা সড়ক পথে পাঠানো হয় নেপালে। এবার পরীক্ষামূলকভাবে সেইসব মালবাহী কন্টেনারে জিপিএস (গ্লোবাল পজিশনিং সিস্টেম) বসিয়ে নজরদারি চালাবে শুল্ক দপ্তর। যতক্ষণ না ভারত-নেপাল সীমান্ত পেরিয়ে গাড়ি সেদেশে ঢুকছে, ততক্ষণ। এই ইলেকট্রনিক কার্গো ট্র্যাকিং সিস্টেম (ইসিটিএস) নামের ব্যবস্থাটির লক্ষ্য, মাঝপথে কন্টেনার খুলে মালপত্র চুরি যাওয়ার ঘটনা আটকানো। শুধু কলকাতা নয়, নেপালে বেশ কিছু পণ্য আমদানি হয় বিশাখাপত্তনম বন্দর দিয়ে। সেখান থেকেও নেপালগামী কন্টেনারে একইভাবে চলবে নজরদারি। গত বছর জুনে ইসিটিএস নিয়ে চুক্তি হয়েছে নেপাল ও ভারতের।

➢ আগামী কয়েক মাসে দেশের বাজারে প্রথমবার শেয়ার ছেড়ে তহবিল তোলার রাস্তায় জমতে চলেছে বিপুল ভিড়। ইতোমধ্যেই এই প্রস্তাবে সেবি-র সায় পেয়েছে ১২-টি সংস্থা। আবেদন জানিয়েছে আরও ২৪-টি। সব মিলিয়ে ৩৬-টি সংস্থা প্রায় ৩৫ হাজার কোটি টাকা মূল্যের শেয়ার ইস্যুর পরিকল্পনা ছকেছে। এর মধ্যে ছ'টি রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা—ইন্ডিয়ান রিনিউয়েবেল এনার্জি ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি, রেল বিকাশ নিগম, ইরকন ইন্টারন্যাশনাল, আরআইটিইএস লিমিটেড, গার্ডেনরিচ শিপবিল্ডার্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ার্স এবং মাজাগন ডক। বাকিগুলি বেসরকারি। সেবি-র কাছে দাখিল খসড়া প্রস্তাব অনুযায়ী, এই তিন ডজন সংস্থার মধ্যে বেশিরভাগই বাজারে প্রথমবার শেয়ার ছেড়ে টাকা তুলতে চায় ব্যবসা বাড়ানোর পুঁজি জোগাড়ের জন্য। অনেকের লক্ষ্য, দৈনন্দিন খরচ চালাতে মূলধন জমা করা। একাংশের নিশানা নথিবদ্ধ হয়ে ব্র্যান্ড-নামের কদর বাড়ানো।

➢ বিশ্বব্যাপী নামজাদা সিইও-দের তালিকায় আরেকবার নাম লিখিয়ে ফেললেন এইচডিএফসি ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টর আদিত্য পুরী। ব্যারন পত্রিকা কর্তৃক প্রকাশিত ওই তালিকায় গোটা বিশ্বের ৩০ জন সিইও-র মধ্যেই আদিত্য পুরীর নামটিও আছে। প্রথম ভারতীয় সিইও হিসাবে সেরা ৩০ জন সিইও-র মধ্যে ব্যারন পত্রিকায় ঠাঁই

করে নিয়েছেন পুরী। তবে এই প্রথম নয়। এই নিয়ে চতুর্থবার এই তালিকায় আদিত্য পুরীর নামটি চলে এল। ১৯৯৪ সাল থেকে এইচডিএফসি ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টর পদে রয়েছেন আদিত্য পুরী। ব্যারনের ওই তালিকায় আদিত্য ছাড়াও রয়েছেন 'অ্যামাজন'-এর জেফ বেজোস, 'ফেসবুক'-এর সিইও মার্ক জাকারবার্ক, 'নেটফ্লিক্স'-এর সিইও রিড হেস্টিংস, 'মাইক্রোসফট'-এর সত্য নাদেলা এবং আরও অনেক নামীদামি কোম্পানির সিইও-রাই।

● **পেনশন প্রকল্প সংক্রান্ত নতুন সিদ্ধান্ত :**

গত ৪ মে একগুচ্ছ সিদ্ধান্ত ঘোষণা করল পেনশন তহবিলের নিয়ন্ত্রক পিএফআরডিএ-র। যেখানে ন্যাশনাল পেনশন সিস্টেমের (এনপিএস) দরজা খুলে দেওয়া হল উচ্চশিক্ষা ও বিশেষ কারিগরি প্রশিক্ষণের জন্য অর্থের সংস্থান করতে। যাতে খরচের বাধায় আটকে না যায় দক্ষতা বাড়িয়ে কর্মযোগ্য হওয়ার চেষ্টা। নিয়ন্ত্রক জানিয়েছে, পাশাপাশি কেউ ব্যবসা শুরু করতে চাইলেও তার এনপিএস জমা থেকে কিছুটা তুলতে পারবেন। সংশ্লিষ্ট মহলের দাবি, কর্মসংস্থান বাড়ানোর পাশাপাশি কেন্দ্র স্বনির্ভর হওয়ার পক্ষে বারবার সওয়াল করছে। তাই এই উদ্যোগ। একাংশ আবার বলছেন, নতুন ব্যবসা শুরু হলেও খুলবে কাজের দরজা। পিএফআরডিএ কর্তৃপক্ষ এদিন জানান, মূলত কর্মসংস্থান বাড়াতেই এইসব পদক্ষেপ। এদিন নেওয়া অন্যান্য সিদ্ধান্তের মধ্যে আছে, বেসরকারি সংস্থার কর্মীদের এনপিএস-এর টাকা শেয়ারে ঢালার সুযোগ বৃদ্ধি ও মাঝারি ঝুঁকির 'A' রেটিংয়ের ঋণপত্রে লগ্নির অনুমতিও। এতদিন কম ঝুঁকির উঁচু রেটিংয়ের (AA) বন্ডে লগ্নি হ'ত। বন্ডে মোট লগ্নির ১০ শতাংশ পর্যন্তই শুধু 'A' রেটিংয়ের ঋণপত্রে রাখা যাবে।

● **তাঁতি সেবা কেন্দ্রের নয়া উদ্যোগ :**

তারা তাঁত বুনে তৈরি করেন কাপড়। কিন্তু তা বাজারে বেচে মোটা মুনাফা পকেটে পোরেন অন্য কেউ। তাঁতিদের কাজের কদর ছড়িয়ে দেশে-বিদেশে। কিন্তু সেই কৃতিত্বের ভাগ অনেক সময় জোটেও না তাদের। সেই ছবিই এবার পাল্টানোর চেষ্টা শুরু হয়েছে কেন্দ্রীয় বস্ত্র মন্ত্রকের অধীন কলকাতার তাঁতি সেবা কেন্দ্রের (উইভার্স সার্ভিস সেন্টার) উদ্যোগে। যেখানে রাজ্যের কয়েকশো তাঁতি ও জনা পনেরো ডিজাইনারকে এক ছাতার তলায় এনে তৈরি হয়েছে একটি মঞ্চ, উইভার্স অ্যান্ড ডিজাইনার্স। চুক্তি মাফিক এখানে তৈরি জামা-কাপড় বাজারে বিক্রি হলে ১৫ শতাংশ মুনাফা সরাসরি পাবেন তাঁতি নিজে। বাকি ১০ শতাংশ যাবে তাদের সমবায় সংগঠনের অ্যাকাউন্টে। সেই সঙ্গে পণ্যে লেখা থাকবে সংশ্লিষ্ট তাঁতির নামও। মুনাফার আর একটা অংশ পাবেন ডিজাইনাররা। তাঁতি সেবা কেন্দ্রের ডেপুটি ডিরেক্টর তপন শর্মার দাবি করেন যে তাঁতিদের আয় বাড়ানোর পাশাপাশি ডিজাইনারদের সঙ্গে তাদের সরাসরি ব্যবসায়িক সম্পর্ক তৈরি করার লক্ষ্যেই এই প্রথম পশ্চিমবঙ্গে এমন একটি মঞ্চ গড়া হয়েছে। এর পরে ডিজাইনার ও তাঁতিদের নিয়ে কোম্পানি আইনে পৃথক সংস্থাও তৈরি হবে। উইভার্স অ্যান্ড ডিজাইনার্সের তরফে জানানো হয়েছে, তাদের তৈরি পোশাকে থাকবে বারকোড। সেখানে দেওয়া থাকবে তাঁতিদের নাম। এমনকী কোন অঞ্চলে কাপড়টি তৈরি হয়েছে এবং ১০০ শতাংশই হাতে বোনা কিনা, তারও উল্লেখ থাকবে স্পষ্ট। ক্রেতাদের জানাতে লেখা হবে তাঁতিরা কত শতাংশ মুনাফা পাচ্ছেন, তা-ও। ঠিক যেমন কৃষিপণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে এখন কৃষকদের নাম ও জমি চিহ্নিতকরণের পরে তা পণ্যের সঙ্গে জানিয়ে দিতে হয়।

● **সরকারি পেনশন পেতে আধার বাধ্যতামূলক নয় :**

পেনশন পেতে গিয়ে আধারের কারণে চরম হয়রানির মুখে পড়তে হচ্ছে বলে অভিযোগ তুলেছিলেন বহু বয়স্ক মানুষ। তাদের বেশ কিছুটা স্বস্তি দিয়ে কেন্দ্রীয় কর্মীবর্গ মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী জিতেন্দ্র সিং জানিয়েছেন, সরকারি কর্মীদের পেনশন পাওয়ার জন্য আধার বাধ্যতামূলক নয়। আধার একটি প্রযুক্তিগত বাড়তি সুবিধামাত্র। যার মাধ্যমে ব্যাঙ্কে না গিয়েও 'লাইফ সার্টিফিকেট' জমার সুবিধা মেলে। উল্লেখ্য, ব্যাঙ্ক, বিমা, মোবাইলের সিম ইত্যাদির সঙ্গে ৩১ মার্চের মধ্যে আধার নম্বর জোড়া বাধ্যতামূলক বলে জানিয়েছিলেন কেন্দ্র। কিন্তু বিষয়টি নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে মামলা চলায়, কিছু দিন আগে কেন্দ্র জানায়, সরকারি আর্থিক সুবিধা দেওয়া হয় এমন প্রকল্প (যেমন রান্নার গ্যাসের ভরতুকি ইত্যাদি) ছাড়া কোনও ক্ষেত্রেই আপাতত আধার জরুরি নয়। সর্বোচ্চ আদালতের মামলার নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত সেই সময়সীমাও অনির্দিষ্টকালের জন্য পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে।

● **ফ্লিপকার্ট-ওয়ালমার্ট লেনদেন :**

দেশে নেট বাজারের সবচেয়ে বড়ো লেনদেন। গত ৯ মে বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ রিটেল বহুজাতিক ওয়ালমার্টের ঘোষণা, ১,৬০০ কোটি ডলারে ভারতীয় ই-কমার্স সংস্থা ফ্লিপকার্ট-এর ৭৭ শতাংশ অংশীদারি পকেটে পুরছে তারা। তবে সেই চুক্তি সফল হতে গেলে সায় পেতে হবে প্রতিযোগিতা কমিশনের। এতে ভারতের নেট বাজারে পা রাখতে পারল ওয়ালমার্ট। ২০২৬ সালের মধ্যে যার অঙ্ক দাঁড়াতে পারে ২০,০০০ কোটি ডলার। এদেশের সম্ভাবনাময় বাজারে, সরাসরি ক্রেতার কাছে পৌঁছনোর সুযোগ খুলছে তাদের সামনে, বিশ্বে দ্রুত বাড়তে থাকা নেট-কেনাকাটার দরুন যে চেষ্টা করছে ওয়ালমার্ট।

● **টেলি মার্কেটিং কল রুখতে আরও পদক্ষেপ :**

বিপণনমূলক (টেলি মার্কেটিং) ফোন অথবা এসএমএস আসার হাত থেকে রেহাই পান না প্রায় কেউই। এই ঘটনা ঘটে 'ডু নট ডিস্টার্ব'-এ মোবাইল নম্বর নথিভুক্ত থাকলেও। এর থেকে স্বস্তি দিতে গত ২৯ মে নিয়ম ভাঙা সংস্থাগুলিকে মাসে সর্বোচ্চ ৭৬ লক্ষ টাকা জরিমানার প্রস্তাব আনল ট্রাই। একই সঙ্গে সুপারিশ করল ব্লকচেন প্রযুক্তি ব্যবহার করে গ্রাহকের হাতে আরও বেশি ক্ষমতা দেওয়ার জন্য। ট্রাইয়ের বক্তব্য, ব্লকচেন প্রযুক্তিতে সহজেই বোঝা যাবে, কে ওই ধরনের ফোন অথবা এসএমএস পাওয়ার অনুমতি দিয়েছেন আর কে দেননি। একই সঙ্গে, কোন মোবাইল পরিষেবা সংস্থার সঙ্গে কোন টেলি মার্কেটিং সংস্থা জোট বেঁধেছে, বোঝা যাবে তা-ও। ট্রাইয়ের দাবি, গ্রাহকের ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষিত রাখার বিষয়টিও নিশ্চিত করবে এই প্রযুক্তি। নিয়ম ভাঙলে টেলি সংস্থাগুলিকে দিনে ৫,০০০ টাকা করে জরিমানা করার সুপারিশও করেছে ট্রাই। ৩০ দিন পরেও এই অবস্থা চললে সেই অঙ্ক বেড়ে হবে দিনে ২০,০০০ টাকা (সর্বোচ্চ ১০ লক্ষ টাকা)। কোনও টেলি মার্কেটিং সংস্থা নিয়মের বাইরে গেলে তাদেরকে জরিমানা করতে পারবে মোবাইল পরিষেবা সংস্থাগুলি। আর এসবের পরেও যদি এই ধরনের ফোন বা এসএমএস ঠেকাতে তারা ব্যর্থ হয়, সেক্ষেত্রে প্রতিটি ধাপে প্রতিবার নিয়ম ভাঙার জন্য জরিমানা গুনতে হবে। এভাবে মাসে সর্বোচ্চ ৭৬ লক্ষ টাকা জরিমানার প্রস্তাব টেলি নিয়ন্ত্রকের।

খেলা

- এশিয়ান হকি চ্যাম্পিয়ন ট্রফিতে লিগের পর পর তিনটি ম্যাচ জিতে গতবারের চ্যাম্পিয়ন ভারত আবারও ফাইনালে পৌঁছলো বটে কিন্তু আয়োজক দেশ দক্ষিণ কোরিয়ার কাছে হেরে গেল ভারতীয় মহিলা হকি দল। ভারত ও দক্ষিণ কোরিয়ার পাশাপাশি গত ১৩-২০ মে এই হকি প্রতিযোগিতায় অংশ নেয় চিন, জাপান ও মালয়েশিয়া।
- গত ২৬-২৭ মে দিল্লিতে আয়োজিত হয় জাতীয় স্তরের ফেডারেশন কাপ ক্যারাটে প্রতিযোগিতা। তাতে কোচবিহারের ৩২ জন ছেলেমেয়ে রাজ্য দলের হয়ে অংশ নেয়। সব মিলিয়ে জেলার প্রতিযোগীদের ঝুলিতে পদক এসেছে ৩১-টি। তার মধ্যে ৩-টি সোনা, ৬-টি রুপো, ২২-টি ব্রোঞ্জ।
- ওয়েম্বলিতে গত ১৯ মে ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডকে হারিয়ে ছয় বছর পরে এফ এ কাপ জিতল চেলসি।

● **তৃতীয় আইপিএল ট্রফি জিতল চেন্নাই :**

গত ২৭ মে সানরাইসার্স হায়দরাবাদকে মুম্বইয়ের মেগা ফাইনালে ৮ উইকেটে হারিয়ে তৃতীয় আইপিএল (ইন্ডিয়ান প্রেমিয়ার লিগ) ট্রফি জিতল মহেন্দ্র সিং ধোনির চেন্নাই সুপার কিংস। এবারের মোস্ট ভ্যালুয়েবল প্লেয়ার এবং সুপার স্ট্রাইকার অব দ্য সিজন কলকাতা নাইট রাইডার্সের সুনীল নারাইন। ১৬ ম্যাচে ৩৫৭ রান করেছেন তিনি, নিয়েছেন ১৭ উইকেট। ১৭ ম্যাচে ৭৩৫ রান করে অরেঞ্জ ক্যাপ জিতলেন সানরাইজার্স হায়দরাবাদের অধিনায়ক কেন উইলিয়ামসন। ১৪ ম্যাচে ২৪ উইকেট নিয়ে এবারের পার্পল ক্যাপের মালিক কিংস ইলেভেন পাঞ্জাবের অ্যান্ড্রু টাই। এমার্জিং প্লেয়ার অব দ্য সিজন ও স্টাইলিশ প্লেয়ার অব দ্য সিজন-এর পুরস্কার পেয়েছেন দিল্লির তরুণ ব্যাটসম্যান ঋষভ পন্থ (১৪ ম্যাচে ৬৮৪ রান)। মরসুমের সেরা ক্যাচ-এর জন্য পুরস্কার পেয়েছেন কিউয়ি পেসার ট্রেন্ট বোল্ট। ফেয়ার প্লে-এর পুরস্কারটি পেয়েছে গতবারের চ্যাম্পিয়ন মুম্বই ইন্ডিয়ান্স।

● **নাদালের একাধিক রেকর্ড :**

জন ম্যাকেনরোর ৩৪ বছরের পুরনো রেকর্ড ভেঙে দেওয়ার পরের দিনই ধাক্কা খেলেন রাফায়েল নাদাল। গত ১০ মে ম্যাকেনরোর রেকর্ড ভাঙার ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই মাদ্রিদ ওপেনের কোয়ার্টার ফাইনালে দমিনিক থিমের কাছে হারলেন নাদাল। একই সঙ্গে খোয়ালেন র‍্যাঙ্কিংয়ের এক নম্বর স্থান। যা ফের চলে গেল রজার ফেডেরারের দখলে। ম্যাচের ফল ৭-৫, ৬-৩। ক্লে কোর্ট শেষবার থিমের কাছেই হেরেছিলেন নাদাল। ম্যাকেনরো এক সময় ক্লে কোর্টে টানা ৪৯-টি সেট জেতার অনন্য নজির গড়েছিলেন। এত দিন পরে স্পেনীয় মহাতারকা ছাপিয়ে গিয়েছিলেন কিংবদন্তি ম্যাকেনরোকে। মাদ্রিদ ওপেনের দ্বিতীয় রাউন্ডে তিনি সরাসরি সেটে হারিয়ে দেন বিশ্ব ক্রমতালিকায় স্থান ১৬ নম্বরে থাকা আর্জেন্তিনার খেলোয়াড় দিয়েগো জোয়াৎজম্যানকে। নাদালের পক্ষে ফল ৬-৩, ৬-৪। যার মানে দাঁড়াল নাদাল ক্লে কোর্টে টানা ৫০-টি সেট জেতার নতুন নজির গড়লেন। এর পর ইতালীয় ওপেনের ট্রফি জিতে রাফায়েল নাদাল টেনিস জীবনের ৫৬ নম্বর ক্লে কোর্ট খেতাবের মালিকানা পেলেন। ইতালীয় ওপেনের ইতিহাসে অনন্য নজিরও হয়ে গেল স্পেনীয় মহাতারকার। এখন তিনি রোম মাস্টার্সের আটবারের চ্যাম্পিয়ন।

● **তিরন্দাজিতে সাফল্য ভারতের :**

মে মাসের শেষের দিকে আয়োজিত মিউনিখ বিশ্বকাপে নামার আগে হ্যানোভারে আন্তর্জাতিক শুটিং প্রতিযোগিতায় সোনা পেলেন ভারতের হিনা সিধু। ১০ মিটার এয়ার পিস্তল বিভাগে হিনার সোনা জেতার পাশাপাশি তার সতীর্থ পি শ্রী নিভেতা পেলেন ব্রোঞ্জ। ফাইনালে দুরন্ত ফর্মে থাকা হিনা এবং ফ্রান্সের মাথিল্ডে লেমোলের প্রথমে টাই হয়। দু'জনেরই পয়েন্ট ২৩৯.৮। এর পরে টাই জিতে সোনা দখল করে নেন হিনা। নিভেতা ২১৯.২ পয়েন্ট স্কোর করেন।

গত ২২-২৯ মে শুটিং বিশ্বকাপ হয় মিউনিখে। তিরন্দাজি বিশ্বকাপে ভারত শুরুই করে রুপো ও ব্রোঞ্জ জিতে। গত ২৫ মে আর্চারি ওয়ার্ল্ড কাপের স্টেজ 'টু'-র দ্বিতীয় পর্বে তিরন্দাজির কমপাউন্ড বিভাগে জোড়া পদক এসেছে। জ্যোতি সুরেখা ভেনাম, মুসকান কিরার ও দিব্যা ধ্যায়ালকে নিয়ে ভারতের মহিলা কমপাউন্ড দল হেরে চাইনিজ তাইপের কাছে হেরে রুপো পেয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয়। একই দিনে মিক্স ডাবলসে তৃতীয় বাছাই জুটি অভিষেক ভর্মা ও জ্যোতি সুরেখা বেলজিয়ান জুটিকে ১৫৮-১৫৫-তে হারিয়ে ব্রোঞ্জ জেতে। সব মিলিয়ে পদক তালিকার শীর্ষে চিন। দ্বিতীয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। মোট চারটি সোনা ও দু'টি রুপো-সহ দশটি মেডেল জিতে ভারত তৃতীয় স্থানে।

● **অ্যালান বর্ডারকে ছুঁলেন অ্যালেস্টার কুক :**

পাকিস্তানের বিরুদ্ধে লর্ডসের মাটিতে প্রথম ম্যাচেই রেকর্ড দিয়ে শুরু করলেন অ্যালেস্টার কুক। অ্যালান বর্ডারের ১৫৩ টেস্ট খেলার রেকর্ড স্পর্শ করলেন তিনি। গত ২৪ মে টানা ১৫৩ টেস্ট খেললেন তিনি। কিন্তু বর্ডার এই রেকর্ড করেছিলেন ৩৮ বছর বয়সে। কুক করলেন ৩৩ বছরে। বর্ডারের থেকে পাঁচ বছর আগে। দু'জনেই বাঁহাতি ব্যাটসম্যান। খেলেছেন ১৫৩ টেস্ট ম্যাচ। দু'জনেই ১১ হাজারের বেশি রান করেছেন। দু'জনেই এসেক্সের হয়ে কাউন্টি চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন দু'জনেই। অ্যাশেস চ্যাম্পিয়ন হওয়ার ক্ষেত্রেও দু'জনে নেতৃত্ব দিয়েছেন। ২৪ বছর আগে ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়েছেন বর্ডার। ২০০৬-এ ভারতের বিরুদ্ধে অভিষেক হওয়ার পরের ম্যাচেই অসুস্থতার জন্য খেলতে পারেননি; তার পর থেকে গত ১২ বছরে ইংল্যান্ডের সব থেকে ধারাবাহিক প্লেয়ার ও সর্বোচ্চ রান রয়েছে কুকেরই ঝুলিতে।

প্রকৃতি ও পরিবেশ

● **সৌর বিদ্যুৎ সংসদ ভবনে :**

অপ্রচলিত শক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে এ এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ। সৌর বিদ্যুতের ব্যবহার শুরু হতে চলেছে সংসদ ভবনে। লোকসভার স্পিকার সুমিত্রা মহাজন এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। প্রকল্পের খরচ প্রায় ছ'কোটি টাকা। কয়েক মাসের মধ্যেই কাজ শুরু হওয়ার কথা। অপ্রচলিত শক্তি মন্ত্রকের অধীনে চলতি বছরেই প্রকল্পের কাজ শেষ করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। প্রকল্পের উপদেষ্টা-পদে নিয়োগ করা হয়েছে সৌর বিদ্যুৎ বিশেষজ্ঞ তথা শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের অধ্যাপক শান্তিপদ গণচৌধুরীকে। তিনি জানান, সংসদের জন্য বিশেষ ধরনের সোলার প্যানেল তৈরি হচ্ছে। সংসদ-চত্বরের নার্সারিতে বিশেষ 'গ্লাস টু গ্লাস' প্যানেল ব্যবহার করা হবে। তার মতে এতে সবুজের ব্যবহার কমবে না, অথচ বিদ্যুতের উৎপাদনও চলবে। তিনি জানান, এই প্রকল্পে ঘণ্টায়

১.২ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ পাওয়া যাবে। তাতে বছরে প্রায় ১.৫ কোটি টাকা বাঁচবে। সেই সঙ্গে প্রতিদিন প্রায় ছ'টন কার্বন নিঃসরণ কমবে।

● **বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার দূষণ সমীক্ষার রিপোর্ট :**

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (হু) গত ২ মে পেশ করেছে তাদের দূষণ সমীক্ষার সর্বশেষ রিপোর্ট। এই রিপোর্টে জানানো হয়েছে, বিশ্বের ১০ জনের মধ্যে ন'জনই অতি দূষিত বস্তুকণাযুক্ত বাতাসে শ্বাস নেন। এছাড়া, বিশ্ব জুড়ে বছরে অকালে মারা যাওয়া ৭০ লক্ষ মানুষের মধ্যে ৪০ লক্ষ মানুষই মারা যান বায়ু দূষণের জেরে। সারা বিশ্বের পরিস্থিতিই কমবেশি উদ্বেগজনক। তবে আমাদের দেশের অবস্থাটা বেশ খারাপ। বিশ্বের সবচেয়ে দূষিত ১০ শহরের মধ্যে ৯-টা এদেশের, প্রথম ২০-তে এদেশের শহর ১৪-টা। বিশ্বের সবচেয়ে বেশি দূষিত শহর এখন কানপুর। হু প্রত্যেক শহরের বাতাসে পিএম (পার্টিকুলেট ম্যাটার) ২.৫ এবং পিএম১০, এই দুই ধরনের দূষিত বস্তুকণার বাৎসরিক গড় ঘনত্বের হিসেব নিয়েছে। পিএম২.৫-এর মধ্যে আছে সালফেট, নাইট্রেট এবং ব্ল্যাক কার্বনের মতো সূক্ষ্ম দূষণকণাগুলি, যেগুলি মানুষের স্বাস্থ্যের পক্ষে সবচেয়ে বিপজ্জনক। বায়ু দূষণের নিরিখে কানপুরের পরেই রয়েছে ফরিদাবাদ (বিশ্বে ২ নম্বর), বারাণসী (৩), গয়া (৪), পাটনা (৫), দিল্লি (৬), লখনৌ (৭)। ৮ নম্বরে আছে প্রথম ১০-এর একমাত্র অভারতীয় শহর বামেন্ডা (ক্যামেরুন)। ৯ নম্বরে আগরা, ১০-এ মুজফ্‌ফরপুর। কানপুরে এই পিএম২.৫-এর গড় ঘনত্ব প্রতি ঘন মিটারে ১৭৩ মাইক্রোগ্রাম। হু প্রস্তাবিত পিএম ২.৫-এর নিরাপদ মাত্রা হল প্রতি ঘন মিটারে ১০ মাইক্রোগ্রাম (১ মাইক্রোগ্রাম হল ১ গ্রামের ১০ লক্ষ ভাগের এক ভাগ)।

তালিকায় ১১ থেকে ২০ নম্বরে থাকা শহরগুলি হল শ্রীনগর, গুরুগ্রাম, পেশোয়ার (পাকিস্তান), রাওয়ালপিন্ডি (পাকিস্তান), জয়পুর, কম্পালা (উগান্ডা), পাটিয়ালা এবং যোধপুর। প্রসঙ্গত, বায়ু দূষণে জেরবার দিল্লি আগের জায়গা বদল করেছে। ২০১০-এর রিপোর্ট অনুযায়ী, বিশ্বের সবেচেয়ে দূষিত শহর ছিল দিল্লি। তবে ২০১২-র পর থেকে সেই ছবিটা পালটাতে শুরু করে। ২০১৫-তে এ শহর ছিল তালিকার চার নম্বরে। তবে এদিনের প্রকাশিত সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে, ছ'নম্বরে নেমেছে দিল্লি। দূষণে দেশের অনেক শহরের থেকেই কম খারাপ অবস্থায় আছে কলকাতা। বিশ্ব তালিকায় কলকাতা রয়েছে ৫৬ নম্বরে। এবং দেশীয় শহরগুলির মধ্যে আছে ১৬ নম্বরে। কলকাতায় পিএম২.৫-এর গড় ঘনত্ব প্রতি ঘন মিটারে ৭৪ মাইক্রোগ্রাম। হু-র নিরাপদ মাত্রা (প্রতি ঘন মিটারে ১০ মাইক্রোগ্রাম)-এর থেকে এটাও কিন্তু অনেকটা বেশি। গোটা দুনিয়ার মধ্যে ৯৬ নম্বরে ও দেশের মধ্যে ১৯-এ রয়েছে মুম্বই। তুলনামূলকভবে চেন্নাই (বিশ্বে-১৭৫, দেশে-২১) এবং বেঙ্গালুরু (বিশ্বে-২২৪, দেশে-২৩)-র অবস্থান আর একটু ভালো। বিশ্বের সবচেয়ে কম দূষিত শহরের মধ্যে রয়েছে আমেরিকার তিন শহর—ওয়েন্ডেন, উইলিস্টন এবং সিনক্লেয়ার। পিএম২.৫-এর গড় ঘনত্ব এই তিন শহরে প্রতি ঘন মিটারে ২ মাইক্রোগ্রাম করে। এই তালিকায় প্রথম কুড়িতে চিনের কোনও শহর না থাকলেও সেদেশের দূষণ-চিত্রটা সার্বিকভাবে খুবই শোচনীয়। কারণ, বিশ্বের সবচেয়ে দূষিত প্রথম ৫০০-টি শহরের মধ্যে রয়েছে চিনের ২৮২-টি শহর।

● **পরিবেশ-বান্ধব গাড়ির নম্বর প্লেটও সবুজ :**

এখনও তৈরি হয়নি নীতি। কিন্তু সেই লক্ষ্যে বৈদ্যুতিক গাড়ি নিয়ে ধাপে ধাপে এগোচ্ছে কেন্দ্র। গত ৯ মে এই ধরনের গাড়ির নম্বর প্লেট কী রকম হবে, তা জানাল কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণ মন্ত্রক। সিদ্ধান্ত অনুসারে, দেশের ব্যক্তিগত বৈদ্যুতিক গাড়িগুলির নম্বর প্লেট হবে সবুজ। তাতে সাদায় নম্বর লেখা থাকবে। বাণিজ্যিক গাড়ির ক্ষেত্রে নম্বর হবে হলুদ রঙের। এদিন সড়ক পরিবহণ মন্ত্রী নিতিন গড়কড়ী বলেন, বৈদ্যুতিক গাড়ি সহজে চিহ্নিত করতেই এই উদ্যোগ। বৈদ্যুতিক গাড়ি নিয়ে নীতি তৈরির পথে এগোচ্ছে কেন্দ্র। ইতোমধ্যেই চোখে পড়েছে সরকারের নানা পদক্ষেপে। যেমন, এই সব গাড়ির চার্জিং স্টেশন তৈরির পথ সহজ করতে বিদ্যুৎ আইন সংশোধন। এদিন গড়কড়ী বলেন নম্বর প্লেট নিয়ে সিদ্ধান্ত এই গাড়ির প্রসারের লক্ষ্যেই।

● **আর্সেনিক বর্জ্য নষ্টে নয়া প্রযুক্তি :**

শুধু জল শোধনেই বিপদ কাটবে না আর্সেনিকের। পরিশোধন কেন্দ্রের বর্জ্যকেও নষ্ট করতে হবে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে। গত ১৬ মে কলকাতায় আর্সেনিক সংক্রান্ত এক অনুষ্ঠানে এমনটাই জানালেন কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রকের প্রাক্তন সচিব তিরুমালাচারি রামস্বামী। তিনি জানান, ওই সব বর্জ্য থেকেও ফের ছড়িয়ে পড়তে পারে বিষাক্ত রাসায়নিক। গ্রামাঞ্চলে আর্সেনিক শোধন যন্ত্রের বর্জ্য যথাযথভাবে নষ্ট করা হচ্ছে না বলে অভিযোগ। বিজ্ঞানীদের একাংশের মতে, জলে আর্সেনিকের উপস্থিতি জানার এবং আর্সেনিক-দূষিত জল শোধনের জন্য এখন যে-প্রযুক্তি রয়েছে, তা খুবই ব্যয়সাপেক্ষ। কল্যাণীর ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব সায়েন্টিফিক এডুকেশন অ্যান্ড রিসার্চ (আইআইএসইআর)-এর দাবি, তাদের প্রতিষ্ঠানের রসায়ন বিভাগের শিক্ষক রাজা ষণ্মুগম একটি নতুন প্রযুক্তি আবিষ্কার করেছেন, যার সাহায্যে একাধারে জলে আর্সেনিকের বিপজ্জনক উপস্থিতি টের পাওয়া যাবে এবং আর্সেনিক দূর করা যাবে। পলিমার প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে একটি 'সেন্সর' তৈরি করা হয়েছে। সেটি জলে ডোবালেই আর্সেনিক রয়েছে কি না, তা জানিয়ে দেবে। রয়েছে একটি ফিল্টারও। সেটি আর্সেনিক পরিশোধন করতে পারবে। আইআইএসইআর-এর সঙ্গে যৌথভাবে ওই প্রযুক্তি বাজারে নিয়ে এসেছে একটি বেসরকারি সংস্থা। সেই সংস্থার এমডি সঞ্জীব পারিয়াল জানান, তুলনায় সস্তা এই ফিল্টার গৃহস্থ বাড়িতে জলের ফিল্টার, অগভীর পাম্পেও ব্যবহার করা যাবে।

● **ইয়ং সায়েন্টিস্ট অ্যাওয়ার্ড :**

গত ফেব্রুয়ারিতেই ঘোষণা করা হয় যে, পুরুলিয়ার কাশীপুরের শিবশঙ্কর গঙ্গোপাধ্যায় কেন্দ্রীয় সরকারের খনি মন্ত্রকের 'ইয়ং সায়েন্টিস্ট অ্যাওয়ার্ড' পাচ্ছেন। সম্প্রতি নয়াদিল্লির বিজ্ঞান ভবনে রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দের হাত থেকে পুরস্কার নিয়েছেন শিবশঙ্কর। তার গবেষণা আসলে বিশ্ব উষ্ণায়নের সঙ্গে লড়াই। কানপুর আইআইটি-র ভূ-পদার্থবিদ্যার শিক্ষক ওই যুবক জানান, ক্রমশ বাতাসে বেড়ে চলেছে কার্বন ডাই-অক্সাইড। পরিবেশের সেই গ্যাস ভূগর্ভে পাঠিয়ে কীভাবে আরও বেশি জ্বালানি তেল সংগ্রহ করা যেতে পারে, সেটাই তার গবেষণার বিষয়। দীর্ঘ দিন ধরে উত্তোলনের ফলে গুজরাতে ক্যাম্বে বেসিনে জ্বালানি তেলের খনিতে সঞ্চিত তেলের ভাঁড়ারে টান পড়ছে। শিবশঙ্কর দাবি করছেন সেখানে এই পদ্ধতি ব্যবহার করলে তেলের উৎপাদন বাড়ানো যেতে পারে।

আদত বাড়ি কাশীপুরে। পঞ্চকোটরাজ হাইস্কুল থেকে ২০০২ সালে মাধ্যমিক। তার পরে আদ্রা নিগমনগর নিগমানন্দ উচ্চ বিদ্যালয় থেকে উচ্চমাধ্যমিক পাশ করে ভর্তি হয়েছিলেন রঘুনাথপুর কলেজ। পদার্থবিদ্যায়

অনার্স। পাশ করে ২০০৮ সালে যান ঝাড়খণ্ডের ধানবাদে জিওফিজিক্স স্কুল অব মাইনসে। ভূতত্ত্ব নিয়ে পড়াশোনা শেষ করে হায়দরাবাদের ন্যাশনাল জিওলজিক্যাল রিসার্চ ইন্সস্টিটিউটে গবেষণা করার সুযোগ পান শিবশঙ্কর। ২০১১ থেকে ২০১৬ পর্যন্ত গবেষণা করেছেন। তার পরে শিক্ষক হিসাবে যোগ দেন কানপুর আইআইটি-তে।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

● **প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় আশার আলো :**

এমন এক এনজাইম বা উৎসেচক যা কোনও প্লাস্টিক বর্জ্যকেই পড়ে থাকতে দিচ্ছে না। এর আগে পাকিস্তানে আবর্জনার স্তূপে হদিশ মিলেছিল প্লাস্টিক-খেকো একটি বিশেষ প্রজাতির ছত্রাকের। হালে 'প্লাস্টিক-খেকো' এনজাইমের হদিশ পেয়েছেন ব্রিটেন ও আমেরিকার এক গবেষকদল। প্লাস্টিক বর্জ্যের দূষণ নিয়ে আমাদের উদ্বেগের দিন শেষ হওয়ার সম্ভাবনা যে একেবারে অসম্ভব নয়, এবার তারই দিশা দেখালেন গবেষকরা। প্রসঙ্গত, প্লাস্টিকের এক বিশেষ যৌগ 'পলিইথিলিন টেরেফ্থ্যালেট' (পিইটি বা 'পেট')। ওই প্লাস্টিক যৌগ গিয়ে বোতল বানানোর জন্য প্রথম পেটেন্ট হয়েছিল ১৯৪০-এর দশকে। বোতল বানানোর জন্য প্লাস্টিক পরিবারের ওই বিশেষ যৌগটিকে বেছে নেওয়া হয়েছিল একটাই কারণে, তা হল—ওই যৌগটি পরিবেশে লক্ষ লক্ষ বছর টিকে থাকতে পারে। হালের গবেষণায় এও দেখা গিয়েছে, প্লাস্টিকের এই বিশেষ যৌগ পলিইথিলিন টেরেফ্থ্যালেট-ই পৃথিবীর স্থল ও জলের বেশিরভাগ অংশে দূষণের অন্যতম প্রধান কারণ হয়ে উঠেছে।

অন্য একটি বিষয় নিয়ে গবেষণা করার সময়েই ব্রিটেনের পোর্টসমাউথ বিশ্ববিদ্যালয় ও মার্কিন শক্তি মন্ত্রকের অধীনে থাকা ন্যাশনাল রিনিউয়েবল এনার্জি ল্যাবরেটরির (এলআরএএল) বিজ্ঞানীরা ওই এনজাইমটির হদিশ পেয়েছেন। গবেষকরা দেখলেন, ওই এনজাইমটি একটি বিশেষ ব্যাকটেরিয়াকে সাহায্য করে প্লাস্টিকের বিশেষ যৌগ 'পেট'-কে ভেঙে ফেলতে সক্ষম। সহযোগী গবেষক, পোর্টসসাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জন ম্যাকগিহান জানিয়েছেন, এনজাইমটির এই ক্ষমতার কথা জানতে পেরে তারা সেই ক্ষমতা বাড়ানোর চেষ্টা শুরু করেন। তার জন্য তারা কয়েকটি অ্যামাইনো অ্যাসিড প্রয়োগ করে দেখেন, তাতে এনজাইমগুলি আরও দ্রুত প্লাস্টিক ভেঙে ফেলতে পারছে। এবার গবেষকরা দেখবেন, আগামী দিনে বড়ো বড়ো শিল্পক্ষেত্রেও এই এনজাইমের কার্যক্ষমতা বাড়িয়ে তাকে প্লাস্টিক বর্জ্য সাফাইয়ের কাজে লাগানো যায় কি না, বাণিজ্যিকভাবে। তারা এটাও দেখবেন, অন্য প্লাস্টিক যৌগ নষ্ট করার ক্ষেত্রেও এদের ব্যবহার করা যায় কি না। কোনও কোনও বিজ্ঞানী বলছেন, এনজাইম আদৌ বিষাক্ত নয় বলে এই পদ্ধতি খুবই কার্যকর হতে পারে ভবিষ্যতে, শিল্পজাত প্লাস্টিক বর্জ্যের পরিমাণ কমাতে। তবে এব্যাপারে আরও গবেষণা দরকার।

বিবিধ

● **বেতারের মাধ্যমে 'ডন কোরাস ডে' :**

চাপড়ামারির জঙ্গলে ভোররাতে পাখির ডাক শোনার সুযোগ সব পর্যটক পান না। গত ৬ মে অল ইন্ডিয়া রেডিও-য় পাখির ডাকে সম্প্রচারের দৌলতেই অনেকের সেই সৌভাগ্য হয়েছে। অনেকেই মনে করছেন, এই সম্প্রচার ডুয়ার্সে পাখি পর্যটনের আগ্রহ বাড়াবে সাধারণ মানুষের মধ্যে। এদিন সম্প্রচারের পর অনুষ্ঠানের বিশেষ দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক মনিকা গুলাটি জানান, এশিয়া তথা বিশ্বের কাছে এই সম্প্রচার চাপড়ামারি তথা ডুয়ার্সকে চেনাতে সাহায্য করবে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত পাখি বিশেষজ্ঞ সুদীপ্ত রায়ের মতে এই অনুষ্ঠান একটা প্রামাণ্য দলিল যা ভবিষ্যতে প্রকৃতিপ্রেমীদের কাজে দেবে। বন্যপ্রাণ সংরক্ষণে সচেনতা বাড়াতেও এই উদ্যোগ জরুরি। তাদের মতো অনেকেরই বক্তব্য, পাখির বৈচিত্র্যের কারণে ২১-টি দেশের কাছে চাপড়ামারির এই সম্প্রচার ডুয়ার্সে সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলবে। বিদেশিদের কাছে এবার শুধু পাখি দেখার আগ্রহেই চাপড়ামারি অন্যতম গন্তব্য হয়ে উঠবে বলেই বিশেষজ্ঞদের মত। এর জেরে পর্যটকদের নজর পড়বে সমগ্র ডুয়ার্সেও। বন দপ্তরের বন্যপ্রাণ বিভাগের উত্তর মণ্ডলের প্রধান বনপাল উজ্জ্বল ঘোষ নিজেও একজন পাখি বিশেষজ্ঞ। তিনিও মনে করেন, চাপড়ামারির সম্প্রচার উত্তরের জঙ্গলের সুনাম আন্তর্জাতিক স্তরে পৌঁছে দেবে। চাপড়ামারির মতো এই ধরনের 'ডন কোরাস ডে' উদ্‌যাপনের উদ্যোগও ডুয়ার্সের অন্য জঙ্গলে নেওয়ারও প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে।

● **পৃথিবীর প্রাচীনতম খনিজ :**

পৃথিবীর বয়স প্রায় ৪৬০ কোটি বছর। আর যে-আগ্নেয় শিলার মধ্যে পৃথিবীর প্রাচীনতম খনিজ 'জারকন'-এর খোঁজ মিলেছে, তার বয়স প্রায় ৪২৪ কোটি বছর! এবং ওই আগ্নেয় শিলা রয়েছে পূর্ব ভারতের ওড়িশায়। এই গবেষণার অন্যতম বিজ্ঞানী, মালয়েশিয়ার কার্টিন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতত্ত্বের শিক্ষক রজত মজুমদার, তার ছাত্রী তথা 'নেচার'-এ প্রকাশিত প্রবন্ধের মূল লেখিকা ত্রিস্রোতা চৌধুরী এবং এক চিনা বিজ্ঞানী, ইউশেং ওয়ান। এই পাথর বিশ্লেষণ করার জন্য দরকার ছিল 'সেন্সিটিভ হাই রেজলিউশন আয়ন মাইক্রোস্কোপ'। গবেষকরা জানাচ্ছেন, সব থেকে পুরনো জারকন মিলেছে পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ায়। কিন্তু সেটি আগ্নেয় শিলা নয়। ওড়িশার চম্পুয়ায় পাওয়া জারকন রয়েছে গ্রানাইট আগ্নেয় শিলার মধ্যে। সেদিক থেকে এই শিলাও প্রাচীনতম। এই খনিজ তৈরি হয়েছে লাভা থেকে।

প্রসঙ্গত, ১৯৮১ সালে তৎকালীন প্রেসিডেন্সি কলেজের ভূতত্ত্বের দুই শিক্ষক আশিসরঞ্জন বসু ও অজিতকুমার সাহা পূর্ব ভারতের এই আগ্নেয় পাথরের বয়স ৩৮০ কোটি বছর বলে দাবি করে 'সায়েন্স' পত্রিকায় প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। কিন্তু অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের এক দল বিজ্ঞানী সেই দাবির বিরোধিতা করে জানান, তাদের হিসেবে নাকি ভুল রয়েছে, ওই আগ্নেয় পাথর ৩৩০ কোটি বছরের পুরনো। সেই দাবিকে নস্যাৎ করতে পারেননি ভারতীয় গবেষকরা। এবার সেই পুরনো তত্ত্বকেই আরও জোরালোভাবে তুলে ধরলেন ভারতীয় ও চিনা ভূবিজ্ঞানীরা। 'নেচার' পত্রিকার প্রবন্ধে তারা জানালেন, জারকন-সমৃদ্ধ ওড়িশার ওই আগ্নেয় শিলার অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ বিশ্বে জলের আবির্ভাবের ইতিহাসে নতুন তথ্য তুলে ধরতে পারে।❑

সংকলক : রমা মন্ডল, পম্পি শর্মা রায়চৌধুরী

(বিবিধ সূত্র থেকে সংকলিত)

ভারত-নেপাল সম্পর্কে আরও দৃঢ়তা

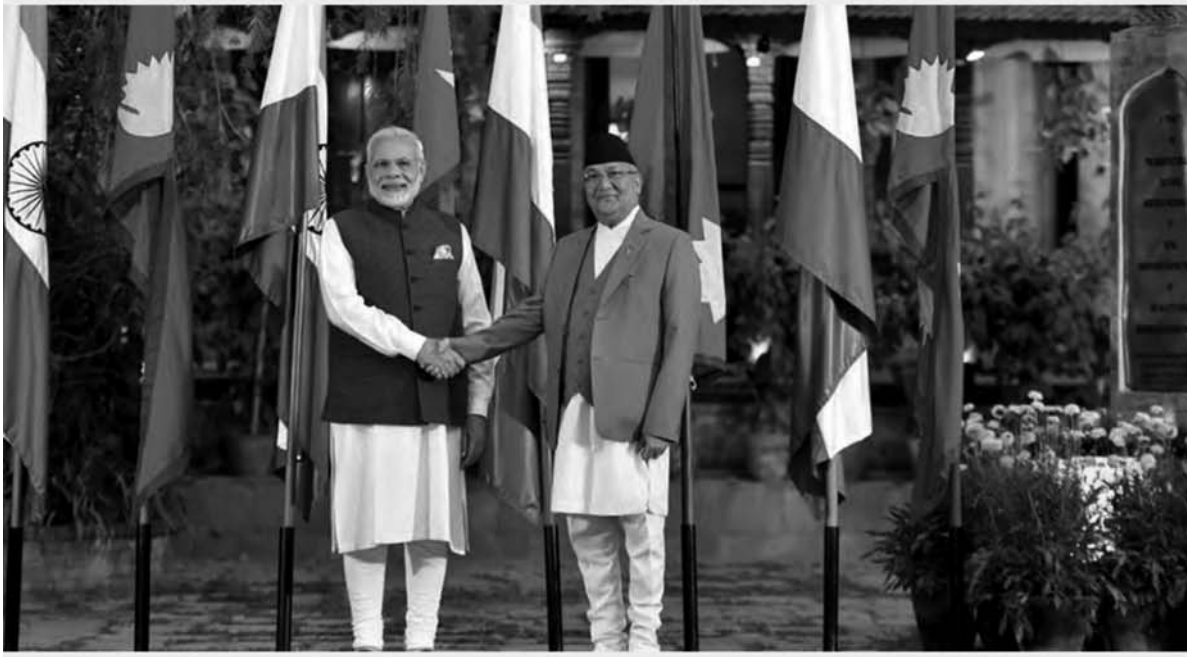

গত ১১-১২ মে প্রধানমন্ত্রী দু'দিনের নেপাল সফরে যান।

দু'দেশের ঘনিষ্ঠ ও বহুমুখী সম্পর্ক নিয়ে পর্যালোচনা হয়। দুই প্রধানমন্ত্রী বিবিধ বহুমুখী ক্ষেত্রে বর্তমান সহযোগিতা আরও জোরদার করা তথা সাম্য, পারস্পরিক বিশ্বাস, সম্মান ও উভয় পক্ষের সুবিধার ভিত্তিতে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে অংশীদ্বারিত্বের প্রসারের মতো পদক্ষেপ নেওয়ার মাধ্যমে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আরও দৃঢ় করতে তাদের অঙ্গীকারের পুনরাবৃত্তি করেন।

সফরকালে দু'দেশের প্রধানমন্ত্রী একসঙ্গে ৯০০ মেগাওয়াটের "অরুণ-৩" জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের শিলান্যাস করেন। জনকপুর (সীতার জন্মস্থান)-এর সঙ্গে অযোধ্যা তথা রামায়ণে উল্লিখিত অন্যান্য পুণ্যস্থলের যোগসূত্র ধরে নেপাল-ভারত রামায়ণ সার্কিট (পর্যটন) উন্মোচন করেন। জনকপুর থেকে জনকপুর-অযোধ্যা বাস পরিষেবারও সূচনা করেন তারা।

> আমার নেপাল সফর এক বিশেষ সময় হচ্ছে, যখন এই দেশ সফলভাবে জাতীয়, প্রাদেশিক ও স্থানীয় নির্বাচন সম্পন্ন করেছে : প্রধানমন্ত্রী

> ১২৫ কোটি ভারতবাসীর শুভকামনা নেপালের মানুষের সঙ্গে আছে। নেপালের মঙ্গল হোক : প্রধানমন্ত্রী

> ভারতের 'সবকা সাথ, সবকা বিকাশ' আর নেপালের 'সমৃদ্ধ নেপাল, সুখী নেপাল' একে অপরের পরিপূরক : প্রধানমন্ত্রী

> দু'দেশের প্রধানমন্ত্রী একসঙ্গে ৯০০ মেগাওয়াটের "অরুণ-৩" জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের শিলান্যাস করেন

Erfan Habib
WBCS 2015 (Gr-A)
Dr. Dipanjan Jana
WBCS 2016 (Gr-A)
Suman Rajbangshi
WBCS 2016 (Gr-A)
Sam Mohammed Sk.
WBCS (Gr-C)
Ajijul Shaikh
WBCS (Gr-A)
Surajit Mondal
(DSP)
Shayan Ahmed
(WBCS) DSP
Ramanath Das
WBCS
বিশিষ্ট লেখক তুজামমেল হোসেনের কোচিং সেন্টার
NEW HORIZON STUDY CIRCLE
POSTAL COACHING | CLASS COACHING | MOCK TEST | INTERVIEW PROGRAMS
C(P) 2/2, 66 Barnaparichay Market (Block A, 1st floor), College st. Kolkata - 700 007
Ph: 033 2241 6899 / 98364 84969
No. 1
Courses Offered
WBCS (Exe.) Full Course
Class Coaching | Mock Tests | Interview Preparation
Special Coaching
Maths, Econ., Current Affairs & Anthro. Optional
Only Mock Test Program
W.B. Miscellaneous Crash Course / Postal Coaching
English Foundation Course
তুজামমেল হোসেন-এর বইগুলি WBCS ও অন্যান্য চাকরির পরীক্ষায় সাফল্যের শেষ কথা
WBCS (Preli. & Mains) পরীক্ষার জন্য যে সব Maths & Reasoning এর materials দরকার তা chapterwise অত্যাধুনিক পদ্ধতিতে exclusive tips সহ সমাধান করা হয়েছে। সঙ্গে আছে WBCS (Preli. & Mains), Central SSC-এর প্রায় সব পরীক্ষা ও IBPS পরীক্ষার প্রশ্নগুলির সঠিক সমাধান।
This book deals with basic concept of Economics that is essencial for the non-economic students. The essential study materials including solutions of questions of WBCS (Preli. & Mains), IAS (Preli.), SSC (CGL) & IBPS etc. Examinations. This is essential for success.
Golden opportunity - Upto WBCS Mains Exam. 2018 suggestive MCQs and crucial practice sets are provided at FREE of cost alongwith this book.
WBCS (Preli. & Mains) ও IAS (Preli. & Mains) সহ যে কোনো ধরনের চাকরির পরীক্ষার উপযোগী ভারতীয় অর্থনীতি বিষয়ে সব ধরণের পঠ্যবস্তু স্বযত্নে বাংলা ও ইংরেজি উভয় মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়েছে। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের সব ধরনের চাকরির প রীক্ষার পূর্বতন বছরগুলি প্রশ্নের সঠিক সমাধান সুত্র এই বই।
Competitive Mathematics for all Competitive Exam.
T. Hossain
Comming Soon
... etc.
Krishnendu Khan
(WBCS 2016)
Durbar Banerjee
(DSP)
Kalyan Laha
WBCS (Gr-C)
Tarikul Islam
(WBCS) R.O.
Rathin Sarkar
WBCS (Gr-C)
Nilanjan Sinha
WBCS (Gr-C)
Eleyas
WBP (S.I.)
Mofijur Rahaman
WBCS (ACTO)
Anjan Chatterjee
(A.P.O)
Aparna Das
(WBCS 216)
Md. Saiful Rahaman
(WBCS) C.T.O
Piyali Mondal
WBCS (Exe.) BDO
Chitra Majumdar
(WBCS) JSWS
Dip Sankar Das
(WBCS) R.O.
Souvik Chatterjee
(WBCS) R.O.
Chandrani Bandhyapadhyay
WBCS (Gr-C)
Sounak Banerjee
WBCS (Gr-A)
Monirul Islam
(WBCS) R.O

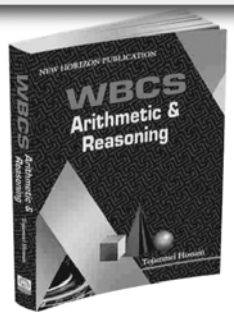

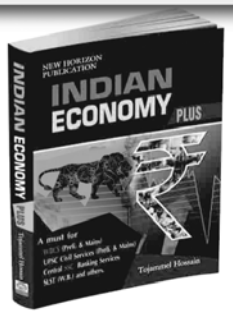

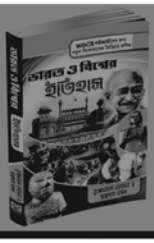

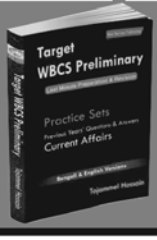

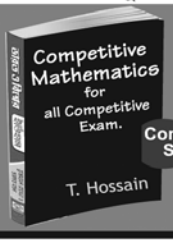

WBCS প্রশিক্ষনের সেরা প্রতিষ্ঠান অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন

1st
EXE
WBCS - 2015
Souvik Ghosh

1st
CTO
WBCS - 2015
Moumita Sengupta

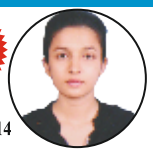
1st
CTO
WBCS - 2014
Suraiya Gaffar

2nd
CTO
WBCS - 2014
Md Shabbar Khan

2nd
DSP
WBCS - 2014
Saquib Ahmed

4th
CTO
WBCS - 2014
Amartya Debnath

4th
EXE
WBCS - 2014
Abhishek Basu

4th
DSP
WBCS - 2014
Rohed Shaikh

OUR SUCCESS IN WBCS			
GROUP	WBCS-2016	WBCS-2015	WBCS-2014
A & B	21	30	43
C	75	60+	65
D	37	30+	12
TOTAL	133	120+	120

EXECUTIVE
Moumita Ghosh

EXECUTIVE
Jayanta Debabrata Choudhury

EXECUTIVE
Sk.wasim Reja

EXECUTIVE
Masud Karim Sk

EXECUTIVE
Rashmidipta Biswas

CTO
Debashis Paul

CTO
Md Warshid Khan

CTO
Sarwar Ali

EXCISE
Suman Maity

EXCISE
Rajbhuban Narayan Biswas

FOOD & SUPPLY
Sangita Banerjee

FOOD & SUPPLY
Shyamal Halder

ADSR
Arijit Dwari

ADSR
Pijush Khan

ADSR
Monojit Barai

ADSR
Raju Sona Sanpui

Jt BDO
Krishnendu Mallick

Jt BDO
Subhranil Dhauria

Jt BDO
Rajarshi Mandal

Jt BDO
Koustuv Sasaru

Jt BDO
Debashis Biswas

Jt BDO
Nisad Ahmed

Jt BDO
Habibulla Laskar

Jt BDO
Tarak Adhikary

CDPO
Sourav Dutta

CDPO
Tanbir Ali Biswas

CDPO
Sourav Sil

CDPO
SK Nasirul Amin

CDPO
MD Ahsan Quadri

CDPO
Satabdi Mondal

RO
Subhadip Prosad

RO
Arun Banerjee

RO
Saranya Barik

RO
Abhishek Ghosh

RO
Manish Samanta

RO
Saikat Mitra

RO
Mihir Talukder

RO
Rajdeep Mehta

RO
Arnab Kundu

RO
Ayan Das

RO
Neeraj Pradhan

RO
Chandan Mallick

RO
Sanjoy Karmakar

RO
Dipankar Dey

স্থানাভাবে সব ছবি দেওয়া গেল না

আপনি কি গ্র্যাজুয়েট ?
তাহলে আপনার লক্ষ্য হওয়া উচিত WBCS

কারণ WBCS সহজ পরীক্ষা এবং WBCS কাউকে খালি হাতে ফেরায় না। অতি সাধারণ মেধার ছাত্রছাত্রীরা WBCS অফিসার হতে পারে যদি থাকে তার তীব্র জেদ, পরিশ্রম করার মানসিকতা এবং সঠিক গাইডেন্স। WBCS এর প্রস্তুতি নিলে কোনও না কোন একটা চাকরি পাওয়াই যায়।

WBCS 2019 - এর ব্যাচে ভর্তি চলছে।

আসন সংখ্যা সীমিত।

প্রকাশিত হল

সামিম সরকারের **ডব্লুবিসিএস প্ল্যানার**

●কেরিয়ার হিসাবে WBCS ●WBCS এর সাত সতেরো ●কেরিয়ার কাউন্সেলিং ●কাদের জন্য নয় WBCS ●প্রস্তুতির গোড়ার কথা ●প্রাক্ প্রস্তুতি উদ্যোগ ●সাফল্যের রোডম্যাপ ●কেন প্রিলিম ? ● বিগত বছরে বিভিন্ন ক্ষেত্রে আগত প্রশ্নের পরিসংখ্যান ও ট্রেন্ড বিশ্লেষণ ●বিভিন্ন বিষয়ের উপর আলোক পাত ●প্রিলিম পাশের কেমিস্ট্রি ●নেগেটিভ নিয়ন্ত্রণের কৌশল ● উত্তরপত্র পূরণের টিপস ● কাট অফ ও টার্গেট স্কোর ● অপশনাল চয়নের কাউন্সেলিং ● অপশনাল বিষয়গুলি ভালো-মন্দ দিক ● কোয়ালিটি উত্তর লেখার কৌশল এবং আরো অনেক কিছু।

(8599955633 / 9038786000

অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন

H.O : The Self Culture Institute 53/6 College Street
(College Square), Kolkata-700073
Website : www.academicassociation.in

(9038786000
9674478600
9674478644

Published on 10th of every month
Posted on 12-13 of every month
DHANADHANYE (Yojana-Bengali)
Price Rs. 22.00

June, 2018
R.N.I. No. 19740/69

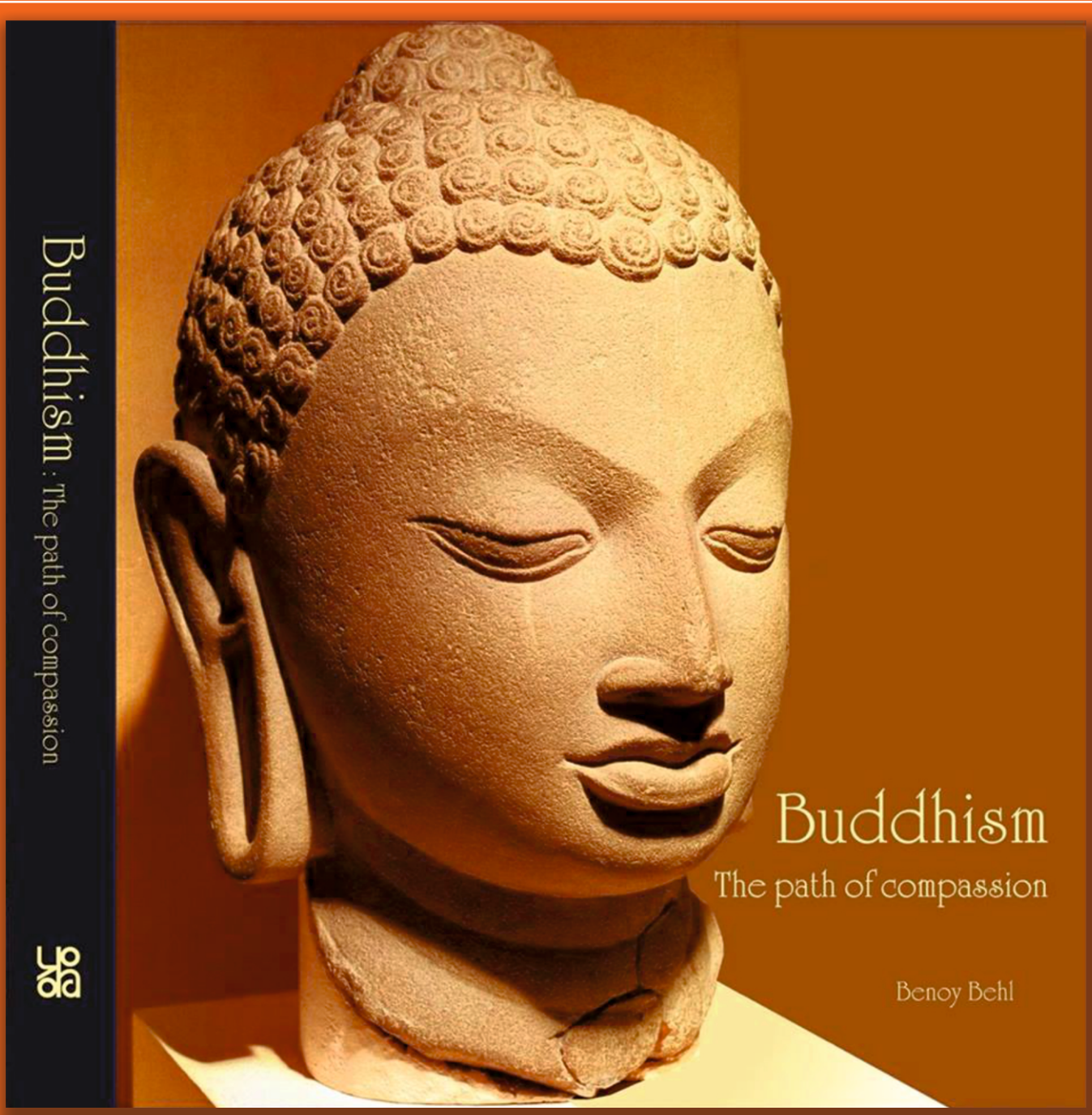

Buddhism
The Path of Compassion

A unique book !

Depicting the Buddhist Heritage of the World

By Benoy K. Behl

Publications Division
Government of India

238 Photographs!
By India's famous cultural photographer

130 Buddhist Sites Covered in 17 countries

কেন্দ্রীয় তথ্য এবং সম্প্রচার মন্ত্রকের পক্ষে প্রকাশন বিভাগের অতিরিক্ত মহানির্দেশক, ড. সাধনা রাউত কর্তৃক
৮ এসপ্ল্যানেড ইস্ট, কলকাতা-৭০০ ০৬৯ থেকে প্রকাশিত এবং
ইস্ট ইন্ডিয়া ফটোকম্পোজিং সেন্টার, ৬৯, শিশির ভাদুড়ী সরণী, কলকাতা-৭০০ ০০৬ থেকে মুদ্রিত।